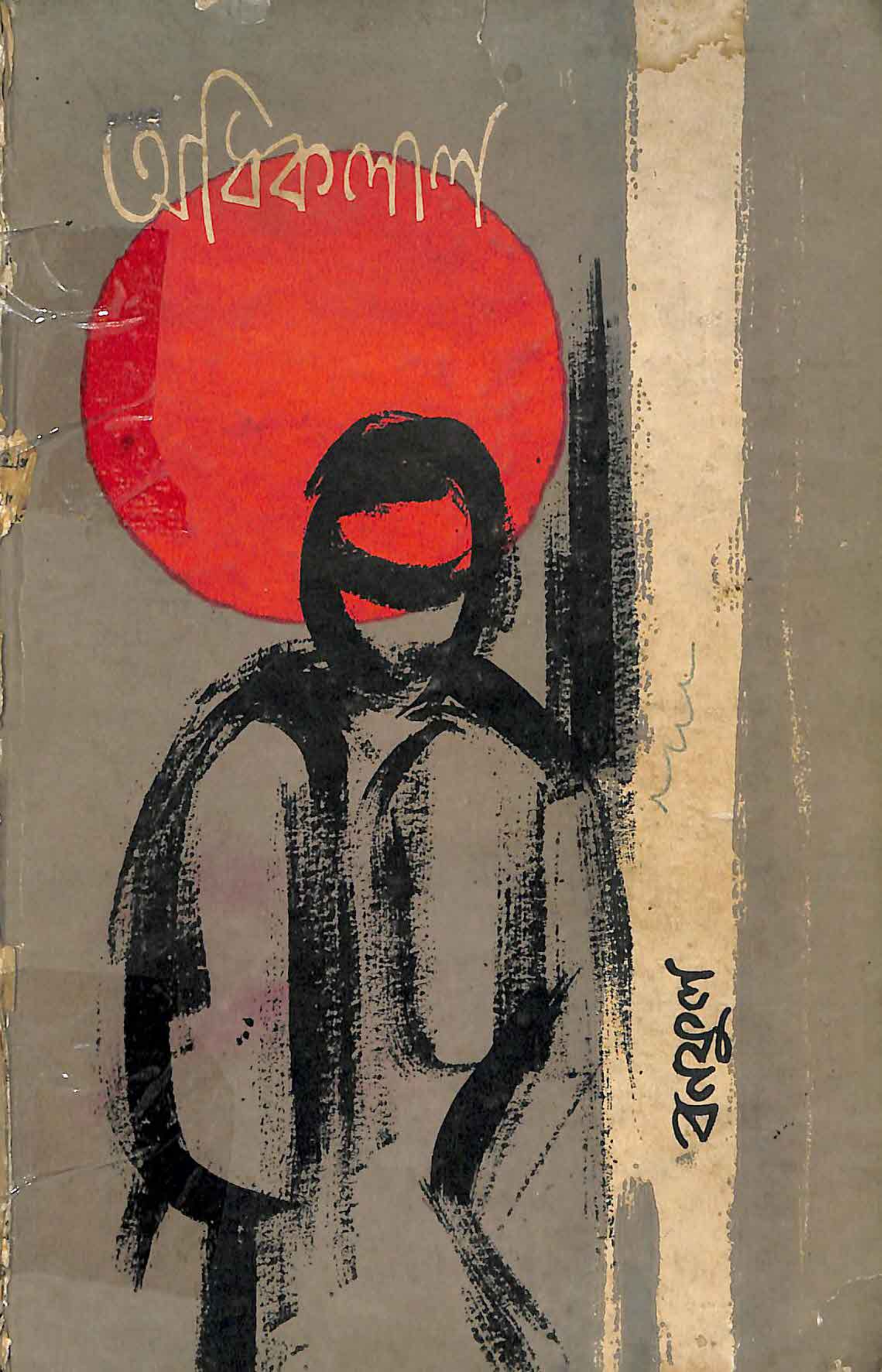

অধিকলাল
বনফুল

অধিকলাল

বনফুল

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৭৬

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণচন্দ্র রায়
সনেট্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীকানাই পাল

চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

প্রাথমিক নিবেদন

অধিকলালের জীবনের অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কাহিনী এটি। অসমাপ্ত, কারণ অধিকলাল এখনও বাঁচিয়া আছে। অসম্পূর্ণ, কারণ কাহিনীর খানিকটা খানিকটা উই-পোকায় মাঝে মাঝে নিঃশেষ করিয়াছে। জীবন-কাহিনীটি লিখিয়াছিল অধিকলালের বন্ধু যোগেন এবং সেটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক।

অধিকলালের জীবনের প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মালমসলা আমিই যোগেনকে দিয়াছিলাম। কলিকাতায় যখন পড়িতে যাই তখন যোগেনের সহিত আমারও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যোগেন এ কাহিনী ছাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তখন অধিকলাল কিছুতেই মত দিল না। সে খাতাটি কাড়িয়া লইয়া একটা কাঠের সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই সিন্দুকের নীচের দিকটা উই-পোকায় ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে। অধিকলালের জীবন-কাহিনীর খানিকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে আমার কল্পনা কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়াছে। অধিকলাল রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই তাহার কণ্ঠস্থ। তাই মাঝে মাঝে তাহার জবানিতে আমি যোগেনকে রবীন্দ্রনাথের দুই একটা কবিতা উদ্ধৃত করিতে উৎসাহিত করিয়াছি। কবিতা আমিই বাছিয়া দিয়াছি। বর্তমান যুগে অধিকলালের নাম কেহ জানে না। নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে বর্তমান যুগের ক্ষণস্থায়ী চেতনায় নিজেকে প্রতিফলিত করা সম্ভব নহে। অধিকলালের একটা জয়ঢাক আছে,

কিন্তু তাহা সে পিটায় নাই, কাহাকেও পিটাইতে দেয়ও নাই। তাই আমাদের দেশের অসংখ্য নাম-না-জানা ভালো লোকের দলে সে হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের প্রকৃত ভালো লোকেরা সকলেই প্রায় অখ্যাত। এমন কি সে যখন চাকরি ছাড়ে তখনও তাহার নাম খবরের কাগজে বাহির হয় নাই। কাগজে নাম বাহির করিতে হইলেও যে তদ্বির করা প্রয়োজন সে তদ্বির করিবার উৎসাহও অধিকলালের ছিল না।/ আমি তাহার অধীনে চাকুরি করিয়াছি। আমি জানি সে কত ভালো অফিসার ছিল। কিন্তু ভালো অফিসারের কদর নাই। তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবারই নানারূপ আয়োজন চতুর্দিকে। অধিকলাল এখন আমাদের বাড়িতেই থাকে। তাহাকে না জানাইয়া তাহার ভাঙা বাক্স হইতে বইটা চুরি করিয়া ছাপিতে দিলাম। জানি না বই বাহির হইলে সে কি বলিবে। অধিকলাল স্বল্পবাক। হয়তো বিশেষ কিছু বলিবে না, একটু মুচকি হাসিবে শুধু। হয়তো মনে মনে ভাবিবে—কি একটা বাজে কাজ করিয়া পয়সা নষ্ট করিয়াছ। তনুর ছেলে বিলাত যাইতেছে, এই টাকায় তাহার কিছু ভালো জামাকাপড় হইয়া যাইত। কিংবা হয়তো—। এই ধরনের কথাই সে ভাবিবে। কিন্তু বইটি ছাপাইয়া আমি বড় তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইহার বেশী আমার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই।

শ্রীনক্ষত্রকান্তি ঘোষ।

প্রথম পর্ব

১

রংলাল রামগোবিন পাঁড়ের চাকর। রামগোবিন এখন অবস্থা-সম্পন্ন লোক, বড় গোলা আছে, ফালাও কারবার। তাছাড়া আছে জাহাজ ঘাটের কুলি কন্ট্রাক্ট। প্রচুর লাভ। জনশ্রুতি কয়েক লক্ষ টাকার মালিক তিনি। কিন্তু আগে এমন ছিল না। আগে রামগোবিনও চাকর ছিল। রেলের চাকর। স্টেশন মাষ্টার লক্ষ্মীবাবু তখন মালিক ছিলেন তার। রামগোবিন নামে যদিও ছিল পয়েণ্টস্‌ম্যান, কিন্তু সব কাজ করিতে হইত তাহাকে। স্টেশনের অন্যান্য কুলিরা 'ডিউটি' শেষ হইলেই চলিয়া যাইত, রামগোবিন যাইত না। রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে গিয়া 'মাইজি'র আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। 'মাইজি' যদিও বন্ধ্যা ছিলেন, নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল না, কিন্তু পোষ্য ছিল অনেকগুলি। গাই ছিল, ছাগল ছিল, দুই তিন রকম পাখী ছিল, তাছাড়া ছিল ভুনিয়া, মুনিয়া, রামদাসোয়া, পেটি, রামদুলারী প্রভৃতি একপাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কুলিপাড়ার ছেলেমেয়েরা। ইহাদের সকলকেই প্রশ্রয় দিতেন লক্ষ্মীবাবুর সেকেলে স্ত্রী। অনেক রকম কুসংস্কার ছিল তাঁহার। স্বামীর নাম লক্ষ্মী বলিয়া তিনি লক্ষ্মীঠাকুরকে ফক্কিঠাকুর বলিতেন। প্রত্যহ কয়েক ঘড়া গঙ্গাজল প্রয়োজন হইত। পাঁড়েই তাহা রোজ বহিয়া আনিত। মাঝে মাঝে যখন বাতে শয্যাগত হইয়া পড়িতেন পাঁড়েই রান্না করিয়া দিত। ঠাকুর ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ পূজা করিতেন সুরেশ্বরী। পূজার যোগাড়ও পাঁড়েই

করিত। ফুল তুলিত, চন্দন ঘষিয়া দিত, পূজার ঘরটি গঙ্গাজলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত সে। খুব কাজের লোক ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। এই সময়েই তাহার রংলালের সঙ্গেও ভাব হয়। রংলালও স্টেশনের একজন কুলি ছিল তখন এবং স্টেশন মাষ্টারের বাড়ির বাসন মাজিত সে। কিন্তু সে দোসাদ ছিল জাতে। তাহার হাতের মাজা-বাসনও সুরেশ্বরী গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিতেন না। এজন্য তিনি একজন জল-চল চাকর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু রামগোবিন বলিল আমি গঙ্গা হইতে জল আনিয়া মাজা বাসনগুলির উপর ঢালিয়া দিব, সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ ব্যবস্থায় সুরেশ্বরী আর আপত্তি করেন নাই। রংলালের উপর মনে মনে তিনি প্রসন্ন ছিলেন, বাসনগুলি যখন মাজিয়া আনে তখন ঝকঝক করে একেবারে। বাড়ির হাতা এবং বারান্দাগুলি যখন ঝাড়ু দেয় তখন একটুও ফাঁকি দেয় না। রংলালের জন্য তাঁহার বাড়ি ঘরদোর তক্‌তক করে। হ্যাঁ, রংলালের উপর মনে মনে খুশীই ছিলেন সুরেশ্বরী। ভাবিতেন, "লোকটা সত্যই ভালো। পূর্বজন্মের পাপে বোধহয় এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছে। আহা—"। রংলাল 'শুখা' বেতনে কাজ করিত। মাসে পাঁচ টাকা বেতন পাইত সে। কিন্তু সুরেশ্বরী রোজ তাহাকে কিছু খাইতে দিতেন। কোনদিন বাসী রুটি, কোনদিন মুড়ি, কোনদিন মোয়া, কোনদিন ছাতু। রংলাল বাড়ি যাইবার আগে রোজ বলিতেন ওরে, দাঁড়া। খাবার নিয়ে যা। রংলাল মলিন গামছাটা পাতিয়া কুণ্ঠিত মুখে উঠানে দাঁড়াইত, সুরেশ্বরী আলগোছে ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া তাহার গামছায় খাবার দিতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছেলেপিলে ক'টি ? রংলাল ছেকাছিনি ভাষায় যাহা বলিয়াছিল তাহার বাংলা— আপনার আশীর্বাদে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার। সুরেশ্বরী

আরও খান চারেক রুটি দিয়াছিলেন তাহাকে। বলিয়াছিলেন— নিয়ে আসিস ওদের একদিন। রামগোবিন সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে হাসিয়া বলিল ওর বড় ছেলে অধিকলাল, খুব 'তেজ' আছে। পণ্ডিতজি বলছিলেন ছোকরা পহেলা নম্বরের। রামগোবিন মাঝে মাঝে বাংলায় নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করিত। রংলালের বড় ছেলে অধিকলাল ক্লাসে সব বিষয়েই প্রথম হয় এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিল সে। সুরেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, ও তাই নাকি। আচ্ছা, নিয়ে আসিস একদিন দেখব।

রামগোবিন সত্যই ভালবাসিত রংলালকে। সে যদিও পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহার ছোঁয়াছুয়ির বিচার ছিল না তেমন, রংলাল যখন হাতের চেটোয় চুন দিয়া খইনি মলিয়া তাহাকে দিত তখন আপত্তি করিত না সে। মুখবিবরে সেটা ফেলিয়া দিয়া জিহ্বার সাহায্যে ঠোঁটের তলায় সেটাকে চালান করিয়া দিত। তাহার পর 'পচ' করিয়া একবার থুতু ফেলিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিত রংলালের দিকে। রংলালের মুখেও হাসির আভা ফুটিত। সত্যই বন্ধুত্ব ছিল দুই জনের। 'মেকী' নয় খাঁটি।

বলিষ্ঠ তাগড়া জোয়ান ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল প্রশস্ত ছাতি, পেশীসমৃদ্ধ বাহু, জঙ্ঘা। মুখটা সুন্দর নয় কিন্তু শক্তিব্যঞ্জক। মনে হইত একটা গণ্ডারের মুণ্ড কে যেন তাহার বৃষস্কন্ধের উপর বসাইয়া দিয়াছে। গণ্ডারের মতো উর্ধ্বমুখী খড়্গা নাই বটে, কিন্তু তাহার নাকটা খড়্গেরই মতো। তখন হইতেই রামগোবিন বুঝিয়াছিল পুরুষকারই পুরুষের একমাত্র সম্পদ। তখন হইতেই তাহার দিনচর্চা বিস্ময়কর ছিল। সে থাকিত গুমটির নিকট রেলের একটা ছোট ঘরে। ঘরটা বে-মেরামত পড়িয়াছিল, লক্ষ্মীবাবুর অনুমতি লইয়া সেই ঘরটাতেই ঘুমাইত রামগোবিন। উঠিত ভোর চারটের সময়। তাহার সম্পত্তির মধ্যে

ছিল একটি কম্বল, একটি খড়ের বালিশ, এবং একটি লোটা। উঠিয়াই সেগুলি গুছাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিত সে। তাহার পর করিত ডন বৈঠক। তাহার পর লোটা-কম্বল লইয়া সে চলিয়া যাইত গঙ্গার ধারে। স্টেশনের নীচেই গঙ্গা। জাহাজ-ঘাটও কাছে। সেখানে শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে নিজের কম্বলটি সে রাখিয়া দিত শিবলালের চাকর গঙ্গারামের নিকট। গঙ্গারাম তখন উঠিয়া উনানে আঁচ দিত। তাহার পর রামগোবিন চলিয়া যাইত ঠেটন গোয়ালার বাথানে। গঙ্গার ধারেই ঠেটন গোয়ালার বাথান। অনেক গরু-মহিষ ছিল তাহার। রামগোবিন সেখানে মহিষের দুধ দুহিত। খুব ভালো দুধ দুহিতে পারিত সে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে প্রায় আধমণ দুধ দুহিয়া ফেলিত। ইহার জন্য ঠেটন তাহাকে নগদ চার আনা পয়সা এবং খাঁটি এক সের দুধ দিত। দুধ দুহিবার পর সে আবার চলিয়া যাইত শিবলালের দোকানে। সেখানে দুধের ঘটিটি রাখিয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিত। শিবলালের দোকানেই তাহার শুকনো কাপড়টা থাকিত। ভিজা কাপড়টা ছাড়িয়া শিবলালের দোকানের পিছনেই লম্বা করিয়া শুকাইতে দিত সেটাকে। একটা খুঁট বাঁধিত বেঁটে আমগাছটার ডালে আর একটা খুঁট শিবলালের দোকানের ঝুঁকিয়া-পড়া চালের একটা বাতায়। গঙ্গা যথাকালে কাপড়টা তুলিয়া রাখিয়া দিত। গঙ্গা তখন হইতেই রামগোবিনের ভক্ত ছিল খুব। পরে সে রামগোবিনের ব্যবসায়ে 'মুনিম্‌জি' অর্থাৎ ম্যানেজার হইয়াছিল। গঙ্গাস্নান করিয়া রামগোবিন যাইত মহাবীরজির থানে। গঙ্গার ধারেই শিবলালের দোকানের একটু দূরে মহাবীরজির থান। একটি আমগাছের নীচে সিন্দুরলিপ্ত মহাবীরজির একটি প্রস্তর মূর্তি। বড় জাগ্রত দেবতা। রামগোবিন এই মূর্তির সামনে দুই কান ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত,

ঠোঁট দুইটি নড়িত কেবল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে সে প্রণাম করিত মহাবীরজিকে। তাহার পর সে আবার ফিরিয়া আসিত শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে। প্রকাণ্ড উনুনটা তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা দুধও গরম করিয়া রাখিয়াছিল। রামগোবিন উনুনের ধারে বসিয়াই অর্ধেকটা দুধ পান করিয়া ফেলিত। বাকিটা সন্ধ্যার পর আসিয়া পান করিবে। গঙ্গার হেপাজতেই দুধটা থাকিত। দুগ্ধ পান শেষ করিয়া রামগোবিন উনুনের পাশে একটা মোড়ায় বসিয়া গঙ্গাকে বলিত—আব, কঢ়াই চড়াও। গঙ্গা প্রকাণ্ড কড়াটা চড়াইয়া খানিকটা ঘি তাহাতে ঢালিয়া দিত। বড় ছান্‌চাটা হাতে লইয়া অপেক্ষা করিত রামগোবিন। গঙ্গা কিছু লুচি বেলিয়াই রাখিয়াছিল। ঘি গরম হইলেই রামগোবিন কড়াইয়ে লুচি ছাড়িতে শুরু করিত। সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত শিবলালের দোকানে লুচি ভাজিত রামগোবিন। ইহার জন্য মজুরি পাইত দশখানা লুচি, কিছু শাক (নিরামিষ তরকারি) এবং খানিকটা বুটের ডাল। সাড়ে ছয়টার সময় উনুনের ধারে বসিয়াই আহার সমাধা করিত রামগোবিন। তাহার পর স্টেশনে চলিয়া আসিত। স্টেশনে ঠিক সাতটার সময় ডিউটি। সাড়ে সাতটায় গাড়ি আসিবে। স্টেশনেও নানা-রকম কাজ। স্টেশনের কাজ তো আছেই, তাছাড়া আছে বড়বাবু এবং ছোটবাবুর নানারকম ফাইফরমাশ। সদ্য-আগত টিকিট কালেক্‌টারবাবুর নববিবাহিত বধূটি বড়লোকের মেয়ে। গৃহস্থালী-কাজে তেমন পারদর্শিনী নয়, তাহার উনুনটাও রামগোবিন রোজ ধরাইয়া দিয়া আসিত। ট্রেন চলিয়া যাইত নয়টার সময়। তাহার পর সমস্ত দিন স্টেশনের তেমন কোনও কাজ থাকিত না। কিন্তু লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে তখন প্রচুর কাজ। সেখানেও গরু দোহা, ছাগল দোহা, পাখীদের স্নান করানো, মাইজির জন্য গঙ্গাজল আনা, বাজার করা এমন কি কাপড় কাচা পর্যন্ত—বাড়ির যাবতীয়

কাজ রামগোবিনই করিত। স্থরেশ্বরী যেদিন অস্থস্থ হইয়া পড়িতেন সেদিন তাহাকে রান্নাঘরেও ঢুকিতে হইত। বাঙালী রান্না রামগোবিন রাঁধিতে পারিত না। ভাতে-ভাত, ডাল এবং 'ভুজিয়া' বানাইত। মাছ মাংস স্পর্শ করিত না সে। সে জন্য কোনও অস্থবিধাও হইত না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে খবরটা পৌঁছাইয়া দিলেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মাছের তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। রামগোবিনের দুপুরের খাওয়াটা লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতেই হইত। লক্ষ্মীবাবুর নিকট সে কোন বেতন লইত না। বেতনের কথা বলিলেই হাত-জোড় করিত। কেন সে এরূপ করিত তাহার রহস্য জানিত কেবল রংলাল। কিন্তু সে কিছু বলিত না, মুচকি মুচকি হাসিত কেবল। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির কাজকর্ম শেষ করিয়া দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির বারান্দায় হাতে মাথা এবং চোখে গামছা দিয়া শুইয়া পড়িত খানিকক্ষণ। শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িত সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকিত। ঠিক আড়াইটার সময় উঠিয়া পড়িত সে। তিনটার সময় লক্ষ্মীবাবুর চা খাওয়ার অভ্যাস। তাঁহাকে চা করিয়া দিয়া রামগোবিন হাটে চলিয়া যাইত। কাছে-পিঠের প্রতি গ্রামেই একদিন না একদিন হাট বসে। লক্ষ্মীবাবুর জন্য রোজ টাটকা তরি-তরকারি কিনিয়া আনিত। নিজেরও কাজ করিত একটু। যে কাজটা তখন 'একটু' ছিল, তাহাই বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পরে। হাটে যাইবার পথে সে রংলালের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া হাঁক দিত—হো রংলাল, চল্, চল্ টাইম্ ভে গেল্। রংলাল কাঁধে একটি বস্তা লইয়া বাহির হইয়া আসিত। বাহির হইতেই বোঝা যাইত বস্তার ভিতর ছোট বড় কয়েকটি পুটুলি আছে। এইবার ব্যাপারটা খুলিয়া বলা প্রয়োজন। স্টেশনে 'সাইডিং'-এ অনেক মাল গাড়ি থাকিত। মাল-মালগাড়িতে থাকিত মাল। নানারকম মাল। ধান গম চাল

ডাল আটা ময়দা সবই বস্তা বস্তা। রামগোবিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বস্তায় ফুটা করিয়া প্রতি বস্তা হইতে চার পাঁচ সের করিয়া মাল সরাইত। তাহার পর গুণ ছুঁচ ও সুতলি দিয়া ছিদ্রটি মেরামত করিয়া দিত। মাল রাখিত সে রংলালের কুঁড়ে ঘরে। রংলাল ভীতু লোক। চোরাই মাল রাখিতে ভয় পাইত সে। কিন্তু সে আরও বেশী ভয় পাইত তাহার স্ত্রী সমুন্দরিকে। যদিও তাহার চারটি ছেলে মেয়ে, বয়স কিন্তু বাইশ তেইশের বেশী নয়। তাহা ছাড়া প্রচণ্ড যৌবন। তাহার সমুন্দরি নামটা সার্থক ছিল সত্যই। তাহার সর্বাঙ্গে যেন যৌবনের ঢেউ উত্তাল। রংলাল বাড়ির মালিক ছিল না, মালিক ছিল সমুন্দরি। সে যাহা বলিত তাহাই হইত। সেই রামগোবিনের চোরাই মাল লুকাইয়া রাখিত, তাহারই আদেশে রংলাল সেই চোরাই মালের পুঁটুলিগুলি বস্তায় ভরিয়া হাটে লইয়া যাইত। সমুন্দরির বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস ছিল না তাহার। কিন্তু মনে মনে খুবই বিরক্ত হইত সে। হাটে যাইবার পথে রোজই সে রামগোবিনকে বলিত—ভাইয়া, ই সব কাম ছোড় দে। চোরা কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনিত না। রাম-গোবিন তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত পৃথিবীতে সবাই চোর, সবাই ডাকাত। কিষুণজির ছেলেবেলায় নাম ছিল 'মাখখন চোর'। মহাবীরজিকে ডাকাত ছাড়া আর কি বলা যায়। অত বড় রাবণের লঙ্কাটা সে—। সমুন্দরি কিন্তু এসব দার্শনিক তত্ত্বে ভোলে নাই। তাহাকে টাকায় চার আনা বখরা দিতে হইত। সপ্তাহে সাতটি হাটে ঘুরিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা রোজগার করিত রামগোবিন। ইহা হইতে দশ বারো টাকা সমুন্দরিকে দিতে হইত। সমুন্দরি সে টাকা দিয়া 'জেবর' (গহনা) কিনিত। রূপার গহনা। এজন্য একটা বদনামও রটিয়া গিয়াছিল তাহার। অনেকেই সন্দেহ করিত রামগোবিনের সহিত নিশ্চয়ই একটু 'নট্‌ঘট্' আছে। কিন্তু কথাটা

সত্য নয়। রামগোবিনের অবশ্য সামান্য একটু দুর্বলতা হইয়াছিল একদিন। সে তাহার গণ্ডারের মতো মুখটাকে যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিয়াছিল, "আ না মেরা পাস রাত মে একদিন গুম্‌টিমে—।' চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল সমুন্দরি। "চোট্টা ভাবনা, ফের ইসব বাত কহবি তো ঝাড়ু দেকে তোরা থোতনা চুরি' দেব—"। রামগোবিন চতুর লোক। সে সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর। সমুন্দরিও সঙ্গে সঙ্গে মাপ করিতে দ্বিধা করে নাই। যৌবনোচ্ছলা নারীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। তাহারা ইহাও জানে যে অধিকাংশ পুরুষদের চিত্তের ভারসাম্য তাহাদের সন্নিধানে বজায় থাকে না। সেজন্য তাহারা প্রায় অনুকম্পাশীলাও হয়। সুতরাং ক্ষতি কিছু হয় নাই। রামগোবিন-সমুন্দরি প্যাক্ট প্রায় তিন বৎসর অটুট ছিল। এই তিন বৎসরে রামগোবিন প্রায় দশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়া স্থানীয় পোস্টাফিসে জমাইয়া অবশেষে 'রাম-গোলা' নামে তাহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমুন্দরিও গহনা গড়াইয়াছিল অনেক। রংলাল বেচারাই কেবল পায় নাই কিছু। সে কেবল হাটে হাটে বোঝা বহিয়া বেড়াইয়াছে মাত্র। কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। কিছু পাইয়াছিল বই কি। সৎ হইয়া থাকার যে আনন্দ তাহা সে পাইয়াছিল। তাছাড়া আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছিল—কিন্তু সে কথা পরে বলিব। যাঁহারা মনে করিতেছেন যে চোর রামগোবিনকে রংলালের পুলিসে ধরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল তাঁহারা রংলাল-জাতীয় লোকদের চেনেন না। রংলালদের শাস্ত্রে 'চুগলি' খাওয়া মহাপাপ। কাহারও সাতে-পাঁচে তাহারা থাকিতে চায় না। তাহারা পরের অসঙ্গত অন্যায় আবদার, এমন কি অত্যাচারও, মুখ বুজিয়া সহ্য করে। তাহা

লইয়া চীৎকার চেঁচামেচি হাহুতাশ বা বিলাপ করা তাহাদের স্বভাব নয়। রংলালকে চিনিত তাহার বউ সমুন্দরি। মনে মনে শ্রদ্ধাও করিত তাহাকে। কিন্তু সে জানিত বাহিরে দাপটের চোটে দাবাইয়া না রাখিলে এই সব 'সাধুসন্ত' প্রকৃতির লোক সংসারটাকেই 'চৌপট' করিয়া দিবে। কিন্তু আসল লোকটাকে চিনিতে সে ভুল করে নাই। আর একজনও তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিল, সে তাহার আট বছরের ছেলে অধিকলাল। শুধু তাহাকে নয়, তাহার মাকে এবং রামগোবিনকেও চিনিয়াছিল সে। আমরা মনে করি ছোট ছেলেরা কিছু বুঝিতে পারে না। কিন্তু সেটা আমাদের ভুল ধারণা। ছোট ছেলেরা নিখুঁত বিচারক। তাহাদের বিচার নির্ভুল। অধিকলাল বুদ্ধিমান ছেলে, সে সবই বুঝিতে পারিত। সে তাহার নিরীহ গোবেচারা পিতাকে খুবই শ্রদ্ধা করিত। মাকেও সে ভালবাসিত, কারণ সে মা, কিন্তু তাহার রণচণ্ডী মূতিটা মোটেই ভাল লাগিত না তাহার। আর সে ঘৃণা করিত রামগোবিনকে। তাহার মনে হইত ও মানুষ নয়, ও দৈত্য। তাহার মন বিষাইয়া উঠিত যখনই সে ভাবিত ওই লোকটির সহিত তাহাদের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রামগোবিনের টাকা লইয়া তাহার মা যখন 'জেবর' (গহনা) গড়াইত, রামগোবিন যখন তাহার বাবাকে অভিভাবকী ভঙ্গীতে আদেশ করিত তখন যে ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ তাহার মনে জাগিত তাহাকে ভাষা দিবার মতো তাহার বয়স হয় নাই তখন। তখন অধিকলালের বয়স মাত্র আট বৎসর।

বছর তিনেক পরে লক্ষ্মীবাবু বারসোই বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন আবদুল জাব্বার নামে একজন মুসলমান ভদ্রলোক। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে মুরগী চরিতে লাগিল। বদনা, পিকদানি এবং পরদার আমদানি হইল। সেই সময়ই রামগোবিন স্টেশনের চাকরি ছাড়িয়া দিল। রংলালকেও সঙ্গে

লইয়া গেল সে। বলিল স্টেশনে তুমি যে বেতন পাইতে আমি তাহার অপেক্ষা এক টাকা বেশী বেতন দিব। তুমি আসিয়া আমার গোলার কাজকর্ম কর। গ্রামের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া রামগোবিন তাহার গোলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। শিবলালের দোকানের গঙ্গা কিছু লেখা-পড়া জানিত। সেও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকানের কাজকর্ম কমিয়া গেলে গোলায় যাইত এবং সমস্ত দিনের হিসাবপত্র একটা খাতায় লিখিত। তখনই দেখা গেল রামগোবিনের স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। প্রত্যেক দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি—কাহাকে কত পয়সা দিল, কাহার নিকট হইতে কত পয়সা পাইল, কে কত ধান চাল ডাল প্রভৃতি লইয়াছে এ সমস্তই সে মনে করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ হইতে শুনিয়া গঙ্গা সে সব টুকিয়া রাখিত। রাত্রি নয়টার পর আসিতেন ছবেজি। স্থানীয় মাইনার স্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার নিকট রামগোবিন ইংরেজি, হিন্দী এবং অঙ্ক শিখিবে প্রস্তাব করিয়াছিল। ছবেজি বলিলেন—ওসব তো তুমি অধিকলালের কাছেই শিখতে পারবে। ওর কাছে পড়া যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি পড়াব। এখন আমি বরং রোজ তোমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাই।

নয়টার পর ছবেজি রামগোলায় সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন। রামগোবিন জোড় হস্তে বসিয়া তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে রামগোবিনের সুরেশ্বরীকে মনে পড়িয়া যাইত বার বার। সুরেশ্বরী সমস্ত অশুদ্ধ জিনিসের উপর গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সেগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। ছবেজি তেমনি রামনামের ছিটা দিয়া তাঁহার সমস্ত পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করিতেছেন মনে করিয়া ভারি একটা তৃপ্তি হইত রামগোবিনের। ছবেজির আদেশও অমান্য করে নাই সে। অধিকলালের নিকটই সে হিন্দী ও ইংরেজি অক্ষরের প্রথম পাঠ লইল। অধিকলাল রামগোবিনকে

তেমন পছন্দ করিত না কিন্তু রামগোবিনের মতো অমন একটা হোমরা-চোমরা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড লোক যে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চায় ইহাতে সে ভারি একটা আমোদ অনুভব করিল। সানন্দেই সে রামগোবিনের গুরুগিরি শুরু করিয়া দিল। তাহার আর একটা কথাও মনে হইত। রামগোবিনই তো তাহাদের সংসার চালাইতেছে। তাহার বাবা এখানেই চাকরি করে। কিছুদিন পরে মা-ও আসিয়া গোলায় বাহাল হইল। সে সমস্ত শস্য কুলায় ঝাড়িয়া বাছিয়া আলাদা আলাদা করিয়া রাখিয়া দেয়। রামগোবিনের নিকট তুবেজিও বেতন পান। অধিকলালের জীবনে রামগোবিন ওতপ্রোত হইয়া আছে। রামগোবিনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু—হ্যাঁ ওই 'কিন্তু'টাই তাহার সমস্ত মনকে মাঝে মাঝে বিষাইয়া দেয়। সে জানে রামগোবিনের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি—অসাধুতা—চুরি। ইহার বিরুদ্ধে বালক অধিকলালের সমস্ত চিত্ত মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত কিন্তু কার্যত কিছুই করিতে পারিত না সে। রামগোবিনের অনুগ্রহ-পাশ ছিন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহা একটা বিরাট অক্টোপাসের মতো তাহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

রামগোবিনের ব্যবসায় দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিল। সে মাল বহিবার জন্য দুইটি গরুর গাড়ি কিনিল। দুধ খাইবার জন্য এবং বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকটি মহিষও। মহিষের সমস্ত দুধ জাহাজঘাটের হালুয়াই শিবলালই কিনিয়া লইত। দুধ বিক্রি করিয়াও বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল রামগোবিনের।

কিছুদিন পরে দেখা গেল রামগোবিন জমিদারের কাছারিতে আনাগোনা করিতেছে। নায়েব মহাশয়ের বাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি দুধও পাঠাইতে লাগিল সে। একদিন কাজিগ্রামের হাট হইতে প্রকাণ্ড একটা রোহিত মৎস্য কিনিয়া নিজে গিয়ে নায়েব মহাশয়ের

বাড়িতে দিয়া আসিল। প্রায়ই দেখা যাইতে লাগিল সে হাত-জোড় করিয়া নায়েব মহাশয়ের সেরেস্তায় মাটিতে উবু হইয়া বসিয়া আছে। এইভাবে কিছুদিন ধর্না দিবার পর তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হাঁসোয়ারা গ্রামের প্রান্তে এক প্লটে যে দুইশত বিঘা জমি 'পড়তি' ছিল সেটি কিছু সেলামী এবং নামমাত্র খাজনা দিয়া রামগোবিন নিজের নামে খারিজ-দাখিল করিয়া লইল। তাহার পরই সে মাতিয়া উঠিল চাষ-বাস লইয়া। বলদ কিনিল, হাল কিনিল, জমিরই একপ্রান্তে মাটি এবং খড় দিয়া ছোট একটা ঘরও বানাইয়া ফেলিল সে। সকলে সেটার নাম দিল রামগোবিনের 'ডোটা'। 'ডোটা' কথাটার মানে সম্ভবতঃ আস্তানা। রামগোবিন তাহার দিনচর্যা পূর্ববৎ বহাল রাখিয়াছিল। খুব ভোরে উঠিয়া সে বার কয়েক ডন বৈঠক করিত, তাহার পর গঙ্গায় ডুব দিয়া মহাবীরজির সামনে কান ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত খানিকক্ষণ। তাহার পর গোলায় গিয়া কয়েকটি মহিষ দুহিয়া ফেলিত। শিবলালের দোকানে গিয়া লুচি ভাজিবার সময় আর সে পাইত না। শিবলালই একটু পরে তাহার জন্য লুচি, ডাল এবং শাক লইয়া হাজির হইত এবং মহিষের দুধ মাপিয়া দোকানে লইয়া যাইত। রামগোবিনের জন্য ভালো প্যাঁড়াও সে প্রস্তুত করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। রামগোবিন "জল খৈ" শেষ করিয়া পদব্রজে হাঁসোয়ারার দিকে রওনা হইয়া যাইত। মাত্র দুই ক্রোশ পথ। আটটা নাগাদ সেখানে সে পৌঁছিয়া যাইত। সেখানে গিয়া যদি সে দেখিত যে 'হালবাহারা' (যাহার হাল চালায়) কাজ আরম্ভ করে নাই তাহা হইলে তুলকালাম্ কাণ্ড করিয়া ফেলিত সে। গালাগালি তো দিতই, মারধোরও করিত। কেহ বিদ্রোহ করিত না, কারণ সকলেই রামগোবিনের খাতক। সকলকেই রামগোবিন ঋণের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের বিশেষত্ব, রামগোবিন ঋণের জন্য কখনও তাগাদা তো

করিতই না, প্রয়োজন হইলে আবার ধার দিত। মাঝে মাঝে সুবিধা মতো তাহাদের বেতন হইতে কিছু কিছু কাটিয়া লইত। তাহাদের খাইবার জন্য 'সিধা'ও দিত সে। অর্থাৎ নূতন রকম দাসত্ব-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিল রামগোবিন। যে তাহার অধীনে একবার চাকরি করিয়াছে সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না, চাহিতও না।

সত্যই রামগোবিনের ভাগ্যদেবতা তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রামগোবিন যাহাই ধরে তাহাই সুফল-প্রসূ হইয়া ওঠে। সত্যই তাহার হস্তে ধুলি-মুঠি সোনা-মুঠিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

হাঁসোয়ারার দুইশত বিঘা জমিতে সেবার দুই হাজার মণ গম ফলিল। সেবার গমের দামও চড়িয়া গেল কিছু। বারো টাকা মণের কম ভাল 'দুধিয়া' গম দুষ্প্রাপ্য হইল বাজারে। রামগোবিন সাহেবগঞ্জের এক ধনী ব্যবসাদারকে বলিল 'তুমি যদি আমার সব গম একসঙ্গে কিনিয়া লও, তোমাকে দশ টাকা মণ হিসাবে গম বেচিব। শুধু তাহাই নয়, তুমি যদি বোরা দাও তাহা হইলে সেগুলি বোরায় পুরিয়া বিনা খরচায় নৌকাতেও উঠাইয়া দিব। আমার অনেক জনমজুর আছে তাহারা সেটা আমার খাতিরে বিনা মজুরিতে তোমার নৌকায় তুলিয়া দিবে। তবে টাকাটা আমাকে 'একাঠ্‌ঠা' (একসঙ্গে) দিতে হইবে। তিনি ইহাতে রাজী হইলেন। রামগোবিন একসঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়া গেল। নগদ পাঁচ সিকা খরচ করিয়া মহাবীরজিকে 'শিরনি' চড়াইল এবং নগদ পাঁচ টাকা খরচ করিয়া বন্ধুবান্ধবদের দহি চূড়া খাওয়াইল। ইহার কিছুদিন পরেই 'খুদ্দি' বাবুর সহায়তায় জাহাজঘাটের কুলি কন্‌ট্র্যাক্‌টিও পাইয়া গেল সে।

মুসলমান স্টেশন মাস্টারটি বেশী দিন রহিলেন না। কেন জানি না, হিন্দু-প্রধান স্টেশনে থাকিতে তাঁহার ভালো লাগিল না।

কণ্ট্রাকটরিটি পাওয়াইয়া দিবার আগে তিনি আর একটি কাজও করিয়াছিলেন। তিনি রামগোবিনকে বলিলেন—"দেখ তোমার ওই পাঁড়ে উপাধিটা বদলাতে হবে। স্টেশনে স্টেশনে যারা প্যাসেঞ্জারদের জল দেয় তাদের নাম 'পানি পাঁড়ে।' আমাদের যিনি বড় সাহেব তিনি বিলেতের খানদানি বংশের ছেলে। তিনি হয়তো তোমার ওই 'পাঁড়ে' উপাধির জন্যই তোমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করে' দেবেন। তিনি যে সে লোককে কনট্র্যাক্ট্ দেবেন না। তোমাকে একটা খানদানি উপাধি নিতে হবে—"

"সমঝা নেই হুজুর, খোলকে কহিয়ে—"

"উপাধিটা রেস্পেক্টেবল (respectable) হওয়া চাই। শুনলেই মনে হবে—হ্যাঁ মানী লোক। শুনলেই যাতে 'গম্' করে' কানে লাগে। সাহেব 'না' বলতে পারবে না—"

"কি করব আপনিই বাতিয়ে দিন—"

"তোমাকে আরও একশ' টাকা খরচ করতে হবে। কাশীতে আমার জানা-শোনা একটি টোল আছে। তারা একশ' টাকা পেলেই 'শাস্ত্রী' উপাধি দেয়। তুমি যদি টাকা দাও সেই উপাধি তোমাকে একটা আনিয়ে দিই।"

"আপনি যা হুকুম করবেন তাই হোবে।"

মাস দুই পরেই রামগোবিন শাস্ত্রী জাহাজঘাটের রেলোয়ে কুলি কণ্ট্রাক্ট্ পাইয়া গেল। জাহাজ হইতে ট্রেনে এবং ট্রেন হইতে জাহাজে মাল তুলিবার জন্য যে কুলি দরকার তাহাই রামগোবিনকে প্রত্যহ জাহাজঘাটে মজুত রাখিতে হইবে এবং প্রতি কুলি পেছু রেল কম্পানি প্রত্যহ তাহাকে আট আনা করিয়া দিবে। ঘাটে দুইশত কুলি মাল বহিবার জন্য মজুত থাকা চাই। ইহাই হইল কনট্র্যাক্ট। রামগোবিনের হাতে জনমজুরের সংখ্যা কম ছিল না। ইচ্ছা করিলে সে দুইশত কুলিই ঘাটে মজুত রাখিতে পারিত। কিন্তু

তিনি নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটি মুসলমান-প্রধান স্টেশনে বদলী হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন খর্বকায় ক্ষুদিরাম মিত্র। খুব করিৎকর্মা লোক। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ও অঞ্চলে 'খুদ্দি' বাবু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রামগোবিন একদিন তাঁহার নিকট হাত-জোড় করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে এক হাঁড়ি ভাল দই ও এক কাঁধি মর্তমান কলা। রামগোবিন তাহার জমির ধারে ধারে প্রচুর কলা গাছ লাগাইয়াছিল।

"এসব কি!"

পুলকিত খুদ্দি বাবু প্রশ্ন করিলেন।

"আমি হুজুর লক্ষ্মীবাবুর নোকর ছিলাম। এখন সামান্য 'ক্ষেতি গিরস্তি' করি, কিছু 'বেওসাও' (ব্যবসা) আছে ছোটা-মোটা। আপনি হাকিম্ মানুষ, আপনাদের যদি 'কিরপা' থাকে—"

"আমিও সামান্য লোক। আমি আর তোমাকে কি কৃপা করতে পারি—"

"হুজুর হিন্ছা (ইচ্ছা) করলে বহুত কুছ্ হোতে পারে। শুনছি ঘাটের কুলি কনট্রাক্‌টে নতুন কনট্র্যাকটার নেবেন আপনারা। গিরবরধারিলাল কনট্র্যাক্‌ট্ নাকি ছেড়ে দিচ্ছেন—"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে কন্‌ট্র্যাকট কি তুমি নিতে পারবে, অনেক টাকার মামলা—"

"কত টাকা—"

"বেশ কিছু টাকা রেল কম্পানিতে জমা দিতে হবে জামানত স্বরূপ। তাছাড়া পানটানও খাওয়াতে হবে নানা জায়গায়। হাজার দশ বারো লেগে যাবে—"

"হুজুর যদি 'কিরপা' করেন যোগাড় করে' ফেলব টাকা—"

খুদ্দিবাবু কৃপা করিয়াছিলেন শ' পাঁচেক টাকা সেলামী লইয়া। উপর-মহলে তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। রামগোবিনকে

কোনদিনই সে তাহা রাখে নাই। চল্লিশ পঞ্চাশটি কুলির দ্বারাই সে কাজ চালাইত। তাহাদেরও পুরা মজুরি দিত না। কারণ তাহারা প্রায় সকলেই ছিল তাহার বেতনভুক ভৃত্য এবং অনেকেই অনুগ্রহপ্রার্থী খাতক। ওই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন কুলিই প্রত্যহ মুখ বুজিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া জাহাজের ও ট্রেনের মাল খালাস করিয়া দিত। ট্রেন অবশ্য মাঝে মাঝে 'লেট্' হইয়া যাইত এজন্য। কিন্তু স্টেশনের বাবুরা 'পান' খাইয়া সমস্ত 'ম্যানেজ' করিয়া দিতেন। রামগোবিন শাস্ত্রীকে মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি বাঁধিয়া একটা রেশমের শাদা কুর্তা গায়ে দিয়া জুতা পরিয়া দুবেলা ঘাটে হাজির থাকিতে হইত এবং সাহেব দেখিলেই সেলাম করিত সে। প্রত্যহ তাহাকে দুই ঘণ্টা করিয়া চার ঘণ্টা জামা-জুতা পরিয়া অকথ্য কষ্ট সহ্য করিতে হইত। খুদ্দিবাবুর নির্দেশেই করিতেই হইত। সুফলও ফলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রামগোবিন শাস্ত্রী ও অঞ্চলে বিখ্যাত ধনী বলিয়া সকলের নিকট সম্মান লাভ করিল। কিছুদিন পরে সে তাহার গোলার নিকটে জগন্নাথ পাঠকের দুই বিঘা জমিটাও হস্তগত করিয়া ফেলিল। জগন্নাথ জমিটা বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট দুইশত টাকা ধার লইয়াছিল। সে ধার সে আর পরিশোধ করিতে পারিল না। জগন্নাথকে রামগোবিন কিন্তু পথের ভিখারী করে নাই। তাহাকে তাহার 'ফাঁসিয়াতলা' কামতের কামতি করিয়া সেখানেই তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। রামগোবিন হু হু করিয়া চারিদিকে জমি কিনিতেছিল। ব্যবসায়েও খুব লাভ হইতেছিল তাহার। কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষপতি হইয়া গেল সে। এই সময়ে আর একটা জিনিস প্রকাশিত হইল যাহা আগে কেহ জানিত না। রামগোবিন জগন্নাথ পাঠকের জমির উপর একটি পাকা বাড়ি বানাইয়া ফেলিল এবং প্রচার করিল যে এইবার সে দেশে গিয়া তাহার 'কনিয়ান্'কে এবং পুত্রকে লইয়া আসিবে।

দেশে যে তাহার বউ ছেলে ছিল একথা ঘুণাক্ষরেও সে জানায় নাই কাহাকেও। সকলেই অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে 'কনিয়ান্' তাহার পুত্র যোগীকে লইয়া আসিয়া পড়িল। স্টেশনে রামগোবিন ছিল না। সে কামতে গিয়াছিল। বয়েল গাড়ি লইয়া হাজির ছিল রংলাল।

বয়েল গাড়ি যখন রামগোবিনের নবনির্মিত পাকা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন অধিকলাল সেই বাড়িরই বারান্দার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিতেছিল। যোগী নামিল। তাহার ন্যাড়া মাথায় প্রকাণ্ড একটি টিকি। কানে সোনার মাকড়ি। পরনে হলদে কাপড়। কিছুদিন পূর্বেই তাহার উপনয়ন হইয়াছিল।

সে গাড়ি হইতে নামিয়া অধিকলালকে প্রশ্ন করিল—তুমি কে?

তাহাদের আলাপ অবশ্য হিন্দীতেই হইয়াছিল। আমি বাংলায় তর্জমা করিয়া দিতেছি। অধিকলাল কোনও উত্তরই দিল না। রংলাল শশব্যস্ত হইয়া পড়িল যেন। একটু আগাইয়া আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"আমার ছেলে বাবুয়া—"

"তোমার ছেলে! তুমি তো আমাদের 'নোকর'—"

"হ্যাঁ, বাবুয়া—"

"নোকরের ছেলে আমাদের বাড়িতে আছে কেন!"

"ও এখানে বসে' পড়াশোনা করে। এখনি চলে যাবে—"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা গুছাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে কিছুদূর গিয়া ভাবিল—কোথায় যাইব? আমাদের বাড়িতে তো পড়িবার স্থান নাই। একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে কতটুকুই বা স্থান থাকিবে। যতটুকু আছে ততটুকুও তাহার মা চাল-ডাল-ধান-গম প্রভৃতিতে ভরিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের গোলা হইতে রোজ সে যতটা পারে 'দানা'ই লইয়া আসে, নগদ পয়সা লয় না। কিছুদিন

পরে যখন 'দানা'র দাম চড়ে তখন রামগোবিনের গোলাতেই তাহা বিক্রয় করিয়া বেশী পয়সা রোজগার করে সমুন্দরি।

অধিকলাল রামগোবিনের গোলার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিত। রামগোবিনকে সে কিছু 'হিসাব' এবং হিন্দী অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। রামগোবিন এখন হিন্দীতে নিজের নামটা সহি করিতে পারে। রামগোবিন রহস্য করিয়া তাহাকে 'গুরুজি' বলিয়া ডাকে। অধিকলাল যদিও মনে মনে রামগোবিনের উপর প্রসন্ন ছিল না, তবু তাহার কেমন যেন একটা ধারণা ছিল রামগোবিনের উপর তাহার একটা অধিকার আছে। কি সে অধিকার, সে অধিকারের বনিয়াদ কত শক্ত তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার মতো বয়স হয় নাই তাহার। কিন্তু যোগীর কথা শুনিয়া এক নিমেষে সে বুঝিতে পারিল রামগোবিনের বাড়িতে বসিয়া তাহার লেখাপড়া করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে রাস্তা ধরিয়া বই খাতা বগলে লইয়া হাঁটিতে লাগিল। স্কুলের দিকেই যাইতে লাগিল সে। হঠাৎ বটগাছটা নজরে পড়িল তাহার। স্কুলের সম্মুখে মাঠের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে সেই গাছটা। সে গিয়া তাহারই তলায় বসিয়া পড়িল। স্কুলের 'হোমটাস্ক' কয়েকটি অঙ্ক তখনও কষা হয় নাই। পেন্সিলটা কোমরে গোঁজা ছিল। খাতা বই বাহির করিয়া অঙ্কে মনোনিবেশ করিল সে। সেদিন রবিবার, স্কুলের তাড়া ছিল না। একমনে অঙ্ক কষিতে লাগিল অধিকলাল। অধিকলালের বয়স তখন তেরো বৎসর। আগামীবার সে মাইনর পরীক্ষা দিবে। স্কুলের উজ্জ্বল রত্ন সে। সব বিষয়েই প্রথম হয়। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই ভালবাসেন তাহাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার সম্বন্ধে হতাশ। প্রত্যেকেই জানেন গরীব রংলালের পুত্র অধিকলাল যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে তুচ্ছতার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। মাইনর স্কুলে তাহার বেতন

লাগে না, বই খাতাও এখন যাহা লাগে তাহা রংলালের সাধ্যাতীত নহে, কিন্তু তাহার পর? তাহাকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তো রংলালের নাই। স্কুলের শিক্ষকরা এইসব জল্পনা-কল্পনা করিয়া নিজেদের মধ্যে দুঃখ করেন কিন্তু অধিকলাল ইহা লইয়া মোটেই মাথা ঘামায় না। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন জানে যে সে উন্নতি করিবেই। যত বাধাই আসুক না কেন সে বাধা সে উত্তীর্ণ হইবেই। কবে কি বাধা আসিবে কেমন করিয়া সে উত্তীর্ণ হইবে এ কথা সে জ্ঞাতসারে ভাবে না, কেবল নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন। সেইদিনই তাহার জীবনের একটা প্রধান ঘটনা ঘটিয়া গেল। অথচ কত সহজেই ঘটিল।

অধিকলাল একমনে অঙ্ক কষিতেছিল। হঠাৎ পেছন হইতে ডাক আসিল—"কি খুদ্‌রুয়া যে। এখানে কি করছ!" অধিকলালের ডাক নাম 'খুদ্‌রুয়া'। কথাটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' হইতে উৎপন্ন। ইহার বাংলা সংস্করণ 'খুদু'।

অধিকলাল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ডাক্তারবাবুর ছেলে নখু (ভালো নাম নক্ষত্র) এবং তাহার ছোট বোন তনু (ভালো নাম তন্ময়া) দাঁড়াইয়া আছে। নখু অধিকলালের চেয়ে বয়সে ছোট। তাহার চেয়ে নীচের ক্লাসে পড়ে। তনু আরও ছোট, তাহার বয়স মাত্র ছয় বছর। কিন্তু তাহারা ডাক্তারবাবুর ছেলে মেয়ে। চাকরের ছেলে অধিকলাল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্ভ্রমসহকারেই প্রশ্ন করিল—"আপনারা এখানে কেন এসেছেন?"

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অধিকলাল যে মাইনর স্কুলে পড়িত সে স্কুলে বাংলা হিন্দী দুইই পড়ানো হইত। স্কুলের হেড পণ্ডিত ভূতনাথ শর্মা বাংলা এবং অঙ্ক পড়াইতেন। ভূতনাথ শর্মা একদিন অধিকলালকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ বাবা, তুমি ভালো ছেলে। তোমাকে একটা সৎপরামর্শ দিচ্ছি। হিন্দী

তোমার মাতৃভাষা। সেটা এমনই তুমি বাড়িতে শিখতে পারবে। কিন্তু স্কুলে তুমি বাংলাটা শেখ। বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে একটি। বাংলা শিখলে তুমি লাভবান হবে।”

অধিকলাল স্কুলে বাংলাই পড়িত এবং ভালো বাংলাও শিখিয়াছিল। সে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের সহিত পরিষ্কার বাংলায় কথা বলিতে পারিত। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলকেই মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করিত সে। ডাক্তার তপনকান্তি ঘোষ এ অঞ্চলের একজন নামী ডাক্তার। খুব প্র্যাকটিস, লোকও খুব ভালো। গরীবদের নিকট ‘ফি’ নেন না। বেশী গরীব হইলে ঔষধের দামও দিয়া দেন। ছেলেবেলায় অধিকলালের একবার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। তপনবাবুই তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন বিনা পয়সায়। অধিকলাল দূর হইতেই ইঁহাদের বাড়ির সকলকেই শ্রদ্ধা করিত। কাছে যাইতে সাহস করিত না। ভাবিত উহারা এমন একটা জগতের লোক যেখানে আমরা বেমানান। সে উহাদের সহিত মিশিবারও চেষ্টা করে নাই কোনদিন। নখুবাবু কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া স্কুলে আসে, কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না, তাহার মুখে কখনও সে কোনও খারাপ কথা শোনে নাই। সেও খুব ভালো ছেলে, নিজের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। অথচ কোন দেমাক নাই। একটা ভদ্র আভিজাত্য সর্বদা তাহাকে যেন ঘিরিয়া আছে।

অধিকলাল স্কুলের ভালো ছেলে। নখু তাহাকে চিনিত। সকলেই চিনিত তাহাকে।

নখু হাসিয়া বলিল—“তুমি এখানে বসে পড়াশোনা করছ? বাঃ বেশ তো।”

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে রামগোবিনের ছেলে যোগী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

তন্নু বলিল—"দাদা, কি করে' পাড়বে তুমি বটপাতা। ও তো অনেক উঁচুতে।"

"রামধনিয়া তো বলেছে একটু পরে পেড়ে দেবে!"

তন্নু মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল—"না এখুনি পেড়ে নিয়ে চল। তুমি পারবে না?"

"আমি গাছে উঠতে পারি না।"

অধিকলাল বলিল, "আমি পারি। আমি পেড়ে দিচ্ছি। কি হবে বটপাতা নিয়ে?"

"কাল আমরা একটা ছাগল কিনেছি। কি সুন্দর যে সেটা দেখতে। তাকে খাওয়াব। বটপাতা খেতে খুব ভালবাসে। তুমি দেবে?"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠিয়া গেল এবং উপর হইতে কয়েকটা বটের ডাল ভাঙিয়া ফেলিয়া দিল। আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল তন্নু। তাহার পর অধিকলাল যখন গাছ হইতে নামিয়া আসিল তন্নু বলিল—"তুমি দাদাকে 'আপনি' বললে কেন! তুমি তো রংলাল মামার ছেলে। তুমি তো আমাদের ভাইয়ের মতন। ভাইকে কেউ আপনি বলে নাকি!"

তন্নু হাসিমুখে উত্তরের প্রত্যাশায় অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল। অধিকলাল কোনও উত্তর দিতে পারিল না। একটা উত্তর তাহার মনে আসিয়াছিল—কিন্তু 'আপনারা আমার বাবার মনিব-পর্যায়ের লোক, আপনাদের আমি আমার সমান ভাবিব কি করিয়া' —এ উত্তরটা দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

নথু বলিল, "খুদরু তুমি এখানে বসেই রোজ পড় তাতো জানতাম না।"

"রোজ পড়ি না। আজই এসেছি। বাড়িতে আমার পড়বার জায়গা নেই।"

তন্নু বলিল—"তাই নাকি। তুমি আমাদের বাড়িতে চল। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে। সেই-খানে তুমি পোড়ো!"

"যেতে পারি। কিন্তু—"

কথাটা কিন্তু অধিকলাল শেষ করিল না।

"কিন্তু আবার কি!"

নখু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"সে তোমার বাবাকে বলব"

"আমিও বাবুকে বলব। বাবু আমার কথা খুব শোনে—"

তন্নু গিন্নীর মতো মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিল অধিকলালকে।

তাহার পর বাস্তব সমস্যাটার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অধিকলাল বটগাছের উপর উঠিয়া অনেক ডালপালা ভাঙিয়া নীচে ফেলিয়াছিল। এগুলিকে এখন বাড়ি লইয়া যাইবে কে।

"দাদা এগুলো কি আমরা নিয়ে যেতে পারব? যতটা পারি নিয়ে যাই চল। ছিন্‌টুর নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে খুব, সকাল থেকে তো বাঁধা আছে—"

"ছিন্‌টু বুঝি ছাগলটার নাম?"

অধিকলাল প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ। পরশু দিন ওটাকে হাট থেকে কিনে আনা হয়েছে, দুটো বাচ্চা সুদ্ধ। মা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তিন তিনবার দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে, তাই মা ওর নাম রেখেছে ছিন্‌টু!"

তন্নু অকৃত্রিম আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

"মা বাচ্চা দুটোরও নাম দিয়েছে ঝিণ্টা আর পিণ্টা—"

আবার হাসি।

নখু বলিল—"চল আমরা একটা করে' ডাল টেনে টেনে বাড়ি নিয়ে যাই। তারপরে রামধনিয়া এসে বাকিগুলো নিয়ে যাবে—"

"আমিই সব পৌঁছে দিচ্ছি—"

একটু দূরেই একটা জমিতে বড় বড় 'কসাল' ঘাস ছিল অনেক। অধিকলাল গিয়া একগোছা বড় বড় ঘাস লইয়া আসিল। তাহা দিয়া সব ডালপালাগুলোকে একত্রে বাঁধিয়া ফেলিল সে। তাহার নিজের বই ও খাতা সেই বোঝাটার উপর বাঁধিয়া একটা বুনো লতা জড়াইয়া মজবুত করিয়া ফেলিল বোঝাটাকে। খানিকটা লতা বাড়তি হইয়া একধারে ঝুলিতে লাগিল।

"চল এইবার—"

সেই লতাটা টানিতে টানিতে অধিকলাল নখু ও তনুর অনুসরণ করিল।

রংলাল তখন গোবিনলালের নবাগত পরিবারের ও 'বাবুয়া'র ফাইফরমাশ খাটিতেছিল আর সমুন্দরি রামগোবিনের গোলায় বসিয়া ঝাড়িতেছিল কলাই। তাহাদের ছোট ছেলে আজবলাল লাট্টু ঘুরাই-তেছিল। তাহার পড়াশোনায় মন ছিল না। প্রায়ই পাঠশালা হইতে পলাইয়া আসিত। তাহার ছোট বোন দুইটাও নিকটে বসিয়া ধূলামাটি লইয়া খেলা করিতেছিল। একটির নাম সুলিয়া (ভালো নাম সুলোচনা) আর একটির নাম তিলিয়া (ভালো নাম তিলোত্তমা)। এই দুইজনের নামকরণ লক্ষ্মীবাবুর স্ত্রী সুরেশ্বরী করিয়াছিলেন।

ইহারা কেহ বুঝিতেই পারিল না যে অধিকলাল তাহাদের ছাড়িয়া আর একটা নূতন জগতে চলিয়া গেল। তাহার নূতন জগৎ এবং পুরাতন জগতের মধ্যে একটা দোলাও দুলিয়াছিল। সেই দোলায় চড়িয়া নানারকম দোলও খাইতে হইয়াছিল অধিকলালকে।

এ কাহিনী সেই দোলের কাহিনী। যে পটভূমিকায় সেই দোলাটা দুলিয়াছিল তাহারই ছবি আঁকিলাম এতক্ষণ।

২

সর্বাগ্রে তনু লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে নখু। নখুর পিছনে অধিকলাল পাতার বোঝাটাকে টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। তপনবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া কলে বাহির হইতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরিলেন।

তনু চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবা, তুমি নাম ঘোড়া থেকে। আমরা খুদরুকে ডেকে এনেছি। সে এখানে পড়বে—"

সত্যই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন তপনবাবু। তনু ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—"জান বাবা, খুদরুই ছিন্টুর জন্যে এইসব বটপাতা পেড়ে দিয়েছে। দেখলাম সে ওই বটগাছটার নীচে বসে' পড়ছে। বলছে তার বাড়িতে পড়বার জায়গা নেই। আমি তাকে ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে' আছে। সেইখানে ও পড়ুক না?"

"বেশ তো। এই ব্যাপার, না আর কিছু?"

"আর কিছু নয়"

তপনবাবু অধিকলালকে চিনিতেন। সে যে স্কুলে ভালো ছেলে এ খবরও শুনিয়াছিলেন তিনি। বলিলেন—"রংলালের ছেলে তুমি? এতো বড় হ'য়ে গেছ। বেশ তো আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসে পড়াশোনা কর—"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"আমাকে আপনি একটা কাজ দিন।"

"কি কাজ! তুমি স্কুলে পড়, তুমি আবার কি কাজ করবে। পড়াশোনা করাই তো এখন তোমার কাজ।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আমি কাজ করেও পড়াশোনা করতে পারব।"

তপনবাবু তাহার মুখভাবে কেমন যেন একটা জেদের ভাব লক্ষ্য করিলেন!

বলিলেন, "আচ্ছা, আমি 'কল' থেকে ফিরে আসি। তারপর ভেবে দেখব তোমাকে কি কাজ দিতে পারি—"

হাসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতা পার হইয়া মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। খুদরুর কথা শুনিয়া তনু পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি কাজ করতে চাও? ভালই তো, আমার কাজ কর না, অনেক কাজ দেব তোমাকে।"

"তোমার আবার কি কাজ!"

"ওমা! আমার আবার কাজ নেই!"

সমর্থনের জন্য নখুর দিকে সে ফিরিয়া চাহিল। নখু বলিল— "হ্যাঁ, যতো সব বাজে কাজ।"

"বাজে কাজ! দোলনা-টাঙানো বাজে কাজ! বেশ, যখন টাঙানো হবে তুমি উঠবে না তো!"

"উঠব না কেন, নিশ্চয় উঠব।"

"কেন উঠবে? কতদিন থেকে খোশামোদ করছি, টাঙাবার ব্যবস্থা তো করতে পার নি।"

অধিকলাল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার বলিল, "চল, আমি টাঙিয়ে দেব। কোথায় টাঙাবে?"

"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে যে আমগাছটা আছে সেইখানে।"

"শক্ত দড়ি আছে?"

"না। খালি দোলনাটা আছে—"

"আচ্ছা, চল দেখি। দড়ি বাজার থেকে কিনে আনলেই হবে।"

নারকেলের দড়ি আনানো হয়েছিল, কিন্তু হকরু বললে পাটের দড়ি চাই। নারকেলের দড়িতে তার নাকি হাতে ফোস্কা পড়ে' খাবে। অনেকখানি দড়ি আছে—"

ভগবতী দেবী চঞ্চলপদে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যেও একটা চঞ্চলা বালিকা সর্বদা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, সে বালিকা তাঁহার কন্যা তন্নুরই সমবয়সী। একগোছা দড়ি লইয়া চঞ্চলপদেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"এই নাও—। এতে হবে তো—"

"হবে। একটু ন্যাকড়াও দিন।"

"ন্যাকড়া কি হবে—"

"খুকু যেখানটা ধরবে সেখানটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে দেব। তাহলে হাতে আর লাগবে না। দড়িটা সত্যিই বড় খর-খরে। আমি ঠিক করে' দেব সব।"

একটু পরে দেখা গেল আমগাছে দোলনা টাঙানো হইতেছে। সকলেই লাগিয়া পড়িয়াছে। নখু, তন্নু, খুদরু এমন কি ভগবতীও। তিনি গাছের উপরও উঠিয়াছেন। মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

দোলনা যখন টাঙানো হইয়া গেল তখন তিনিই সর্বাগ্রে দোলনায় বসিয়া একবার দুলিয়া লইলেন।

অধিকলাল বলিল—"আমি এইবার একটু পড়তে বসব। অঙ্ক এখনও বাকি আছে কয়েকটা—"

পশ্চিম দিকের বারান্দাতেই বসিয়া পড়িল সে।

"তুমি বাড়িতে খেতে যাবে না?"

"আমি খেয়ে এসেছি—"

"কি খেয়েছ?"

"ছাতু—"

"দিনে আর কিছু খাবে না?"

তাহারা সকলে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

তনু নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া একেবারে শোওয়ার ঘরের বারান্দার উপর উঠিয়া ডাক দিল—'দেখ মা, কাকে এনেছি। ছিন্টুর জন্যে খাবারও এনেছি অনেক—'।

তপনবাবুর স্ত্রী ভগবতী বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওমা এ কি কাণ্ড! এত বটপাতা খাবে কে! ছিন্টুকে বাইরের মাঠে বেঁধে দিয়ে এসেছে হকরু। ও কে খুদরু না কি! রংলালের ছেলে! এস বাবা এস—"

অধিকলাল আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস। তোমার বাবা তো আজকাল পাঁড়েজির গোলায় কাজ করে?"

"হ্যাঁ—"

তনু বলিল—"ও এইবার আমাদের বাড়িতে থাকবে। পশ্চিমের খালি ঘরটায় পড়াশোনা করবে। আর আমার কাজ করবে।"

"ও তাই নাকি—!"

"হ্যাঁ, বাবাকে বলেছি। বাবা বলেছে, বেশ তো। আমার দোলনাটা এখনই টাঙিয়ে দে খুদরু।"

"দাঁড়াও আগে দড়ি যোগাড় করি।"

ভগবতী দেবী বলিলেন—"না বাবা দোলনা টাঙিয়ে দিও না। পড়ে' গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।"

অধিকলাল বলিল—"না, আমি খুব নীচু করে' টাঙিয়ে দেব। যদি পড়েও যায় বেশী লাগবে না।"

তনু নিকটে দাঁড়াইয়া অকারণে লাফাইতে লাগিল।

"বেশ তাই দিও তবে। যা দস্যি মেয়ে—"

"আগে কিছু দড়ি যোগাড় করি"

"দড়ি দিচ্ছি তোমাকে। কুয়ো থেকে জল তোলবার জন্যে

ভগবতী বলিলেন, "আমরা ওকে আজ 'নেওতা' দিয়েছিলাম। তুই খাবি? অনেক রান্না হয়েছে।"

"নেই মাইজি। আমার সুলিয়া তিলিয়া আজুয়া কেউ খায় নি এখনও—"

"ওদের জন্যেও দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যা।"

তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। সমুন্দরি অধিকলালের খাওয়া দেখিতে লাগিল। ইহাতে আশঙ্কার কিছু ছিল না, তবু একটা অজানা আশঙ্কা তাহার মনে যেন ছায়াপাত করিল।

৩

অধিকলালের সহিত তপনবাবুর নিভৃতে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাতে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। অধিকলাল থামিয়া থামিয়া সসঙ্কোচে যাহা বলিয়াছিল তাহার মর্ম এই—"আমি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসিয়া যদি লেখাপড়া করিবার সুবিধা পাই তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব। আমার বাড়িতে বা রামগোবিনজির গোলায় বসিয়া আমি পড়াশোনা করিতে পারি না। বাড়িতে স্থানাভাব, রামগোবিনের গোলায় তাহার পুত্র যোগীন্দ্রনাথ আসিয়াই যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা মর্মান্তিক। তাহার ও কথার পর আর ওখানে যাওয়া চলে না। তাই আমি ঠিক করিয়াছিলাম ওই বটগাছটার নীচে বসিয়াই পড়াশোনা করিব। কিন্তু নখু আর তন্নু আমাকে জোর করিয়া এখানে আনিয়াছে। বলিতেছে পশ্চিম দিকের ঘরটায় তুমি লেখাপড়া কর। আপনিও সে কথা বলিয়াছেন, মায়েরও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার একটি কথা আছে। আপনার অনুগ্রহের আওতায় আমরা চিরকাল বাস করিয়াছি। সে আওতার

"না। রাত্রে একেবারে ভাত খাব"

একটু পরে সে দেখিল ভগবতী দেবী একটা রেকাবিতে খানিকটা মোহনভোগ এবং চারখানা মাছ ভাজা লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তনু।

"এ কি!"

অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"ছেলেদের জন্যে করলুম। ডালাবীর থেকে একটা বড় রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে দিনু মহলদার। খাওয়াদাওয়া করতে দেরি হবে আজ। নখু বলছে ঘি-ভাত আর দম্‌পোক্ত করতে। তুমিও এখানে খাবে আজ। কেমন? এখন এগুলো খেয়ে নাও।"

অধিকলাল কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না।

তনু তাহার পিঠের দিকে গিয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"কোন কথা বলছ না কেন?"

"কি বলব—"

"বল, আচ্ছা।"

"আচ্ছা।"

ভগবতী ধমক দিলেন।

"অসভ্য মেয়ে, নাব ওর কাঁধ থেকে—"

তাঁহার চোখ-মুখ হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেইদিন বেলা দুইটার সময় অধিকলাল যখন বারান্দার একধারে বসিয়া আহারে ব্যাপৃত ছিল তখন সমুন্দরি আসিয়া উপস্থিত। ছেকাছেনি ভাষায় বলিল—

"এ কি তুই এখানে! আমি চারদিকে খুঁজে মরছি—"

বাহিরে যাইবার সাধ্য আমার নাই। তবু একটা কথা বলিবার আছে। একেবারে কিছু না করিয়া কেবল আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আপনার বাড়িতে থাকিব ইহাতে আমার মন সরিতেছে না। ইহাতে আমি শান্তি পাইব না। আমি আপনার বাড়িতে থাকিব, কিন্তু আপনি আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোনও কাজই আমি পারিব। আপনার ঘোড়ার জন্য মাঠ হইতে রোজ ঘাস আনিতে পারি। আপনার বাগানের কাজও করিতে পারিব আমি। মাইজি যদি আমাকে দিয়া বাসন মাজাইয়া লন বা আমাকে যদি ঘর ঝাড়ু দিতে বলেন তাহাও আমি সানন্দে করিব। কিন্তু আপনার কোনও উপকারে না লাগিয়া আপনার বাড়ির একটি ঘর দখল করিয়া বসিয়া থাকিব ইহা আমার মোটেই ভালো লাগিতেছে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"যে সব কাজ তুমি করতে চাইছ তার জন্যে তো আমার লোক আছে। তাছাড়া ওসব কাজ করলে তুমি লেখা-পড়া করবে কখন।"

"রাত্রে—"

তপনবাবু অধিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তাহার সঙ্কল্প অটল।

বলিলেন, "তাহলে তুমি এক কাজ করো—"

"কি বলুন—"

"আমার লাইব্রেরিটার ভার নাও। তুমি বাংলা জানো তো?"

"জানি। স্কুলে বাংলাই তো পড়ি, হিন্দী পড়ি না। বাংলা আর ইংরেজি।"

"হিন্দীও শেখ। যত ভাষা শিখবে ততই লাভ হবে। তাছাড়া হিন্দী তোমার মাতৃভাষা ওটা শেখা চাইই।"

"হিন্দী বই আমি পড়তে পারি।"

"বেশ তাহলে তুমি আমার লাইব্রেরিটার দেখাশোনা কর।

আমি প্রতিমাসেই কিছু কিছু বই কিনি। সব অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। যে পড়তে নিয়ে যায় সে আর ফেরত দেয় না। তুমি বইগুলোর একটা 'লিস্ট্ তৈরি করে ফেল আস্তে আস্তে। তারপর এক এক রকম বই এক জায়গায় রাখ—"

"বেশ। তাই করব।"

খুব খুশী হইল অধিকলাল। তাহার মনের মতো কাজ।

"কোথায় আপনার লাইব্রেরি ?"

"ওই যে বাগানের ভিতর ছোট আর একটা বাড়ি আছে সেই-খানেই। তাতে তুটো ঘর আছে। একটা বড় আর একটা ছোট। বাইরে থেকে কোনও অতিথি এলে ছোট ঘরটায় থাকেন। বড় ঘরটায় লাইব্রেরি আছে। আলমারি টেবিল সব আছে সেখানে—"

তপনবাবু টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা চাবি বাহির করিয়া দিলেন তাহাকে।

"এই নাও ওই বাড়ির চাবি। লাইব্রেরিতে বসেই তুমি পড়া-শোনা করতে পার। পশ্চিম দিকের ঘরে থাকবার দরকার কি। ও ঘরটা আরও নির্জন—"

অধিকলাল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। একটু পরেই সে লাইব্রেরি ঘরটি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল অনেক বই। কুড়িটা আলমারিতে বই ঠাসা! ঘরে কিন্তু চতুর্দিকে ধূলা। ঘরের কোণে কোণে মাকড়শার জাল। সে তৎক্ষণাৎ একটা ঝাঁটা আনিয়া ঘরটা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল্। একটু পরেই তন্থ আর নখু আসিয়া হাজির। তন্থ কপালে চোখ তুলিয়া সভয়ে বলিল, "এখানে কি করছ খুদরু!"

নখু ধমক দিল।

"ফের খুদরু বলছিস? মা খুদরুদা বলতে বলে দিয়েছে না?"

তাহার পর খুদরুর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—"আমিও

তাহার পর অধিকলালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাঃ, তুমি তো ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলেছ দেখছি। তুমি এই ঘরেই দিনে পড়াশোনা কোরো। কিন্তু রাত্রে এখানে শোওয়া চলবে না। এই একটেরে বাগানের মধ্যে একা ছেলেমানুষ রাত্রে থাকবে কি করে? ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই রাত্রে শুয়ো। এখানে রাত্রে ভয় করবে। ও ঘরে খাটিয়াও আছে—"

অধিকলাল শান্ত কণ্ঠে কহিল—"আমার ভয় করবে না।"

না বাপু দরকার নেই। আমার মনে স্বস্তি থাকবে না তুই এখানে শুয়ে থাকলে। তুই ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই শুবি। এখন সব খাবি চল। লুচি ভাজছি। খুদরু তুইও আয়—"

"আমি এখন খাব না। আমি একেবারে ছাতু খেয়ে স্কুলে যাব, রোজ যেমন যাই।"

"তবু দু'একখানা লুচি খাবি আয়।"

ভগবতী জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। রান্না-ঘরের বারান্দায় বসিয়া নখু ও তনুর সহিত সে আট-দশখানা গরম গরম সদ্যভাজা লুচি আলু চচ্চড়ি সহযোগে খাইয়া ফেলিল। খুব ভালো লাগিল। পেটও ভরিয়া গেল। লুচি খাইয়া সে আবার চলিয়া গেল লাইব্রেরি ঘরে। মেঝেতে এবং টেবিলের উপর অনেক ধূলা পড়িয়াছিল। ঝাড়ু দিয়া সে সমস্ত পরিষ্কার করিল। তাহার পর চাবিটা লইয়া সে একটা আলমারি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল উপরের তাকে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই। একটা বই পাড়িয়া খুলিতেই চোখে পড়িয়া গেল একটা লাইন—"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী। মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি।" যদিও ইহার পুরা অর্থ তাহার বোধগম্য হইল না, কিন্তু তাহার অন্তরতম সত্তা যেন বাজিয়া উঠিল। সেও যেন নীরব সঙ্গীতে বলিতে লাগিল "ওগো সুদুর বিপুল সুদুর তোমার

তোমাকে খুদরুদা বলব এখন থেকে। তুমি আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কিনা।"

তন্নু মাতৃআজ্ঞা অমান্য করিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভাবটা সামলাইয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"তুমি এ ঘরটা খুলে পরিষ্কার করছ কেন খুদরুদা ?"

"আমি এই ঘরেই থাকব। ডাক্তারবাবু বলেছেন। তিনি আমাকে লাইব্রেরিয়ান করে দিয়েছেন !"

"এই ঘরে থাকবে তুমি ! এ ঘরে থেকো না। হকরুকে বাবা এই ঘরে শুতে বলেছিল, সে বললে এখানে আমি কিছুতে শোব না। এখানে হাওয়া আছে।"

"হাওয়া তো সব জায়গায় আছে—"

"হকরু যে হাওয়ার কথা বলেছে সে হাওয়া মানে ভূত। রাত্রে কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা কয় আর খিক খিক করে হাসে !"

নখু বলিল, "ও সব বাজে কথা খুদরুদা। হকরুটা গাঁজা খায়। আর গাঁজার ঘোরে যা তা বলে। ও বলছিল সমস্ত গিধারা (শকুনরা) ভূত। দিনের বেলায় পাখী সেজে মড়া খায় আর রাত্তির বেলা জিন হয়ে জ্যান্ত মানুষ খায়। শকুন দেখলেই তাই ও রাম নাম করে—"

এমন সময় হাসিমুখে ভগবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কি হচ্ছে এখানে সব ?"

তন্নু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "খুদরুদা এখানে থাকবে বলছে, বাবা ওকে 'লাইবেলিয়ান' করে দিয়েছে। খুদরুদা এখানে বসেই পড়া-শোনা করবে। রাত্রে এখানে শোবে। হকরু বলেছিল এ বাড়িতে 'হাওয়া আছে—তাই না ?"

"তুই থাম !"

এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিলেন ভগবতী

বাঁশরী আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু কি করিয়া যাইব তোমার কাছে—"।

সমস্ত কবিতাটা পড়িয়া অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

"খুদরুবা—"

বাহিরে আসিয়া দেখিল সমুন্দরি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ময়লা কাপড়, তাহার মাথায় অপরিষ্কৃত চুলের বোঝা, তাহার চোখের কোণে পিঁচুটি, তাহার হলুদ রঙের দাঁত তাহার চোখ মুখের হিংস্র ভঙ্গী, তাহার ময়লা শতচ্ছিন্ন কুর্তার অন্তরালে তাহার দুগ্ধ-স্ফীত স্তনযুগলের অভব্য প্রকাশ হঠাৎ অধিকলালের চেতনায় এমন একটা আঘাত হানিল যে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুহ্যমান হইয়া গেল। এই তাহার মা! হাস্যময়ী সুন্দরী স্নেহপরায়ণা সভ্যভব্য ভগবতীর সহিত ইহার তুলনা চলে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে ভগবতী তাহার মা নয়, সমুন্দরিই তাহার মা।

"তুই খেতে গেলি না? স্কুলে যাবি না?"

"এখনি স্কুলে যাচ্ছি। এখন আর খাব না। মাইজি আমাকে লুচি খাইয়েছে—"

"লুচি! সেদিন পোলাও খেয়েছিস, আজ লুচি খাচ্ছিস, ব্যাপার কি! মাইজি তোকে 'দুল্হা' (জামাই) বানাবে না কি!"

অধিকলালের চোখের দৃষ্টি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিল না। তবু তাহার চোখে মুখে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহার অর্থ—মুখ সামলে কথা বল।

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল সমুন্দরি খোলা দ্বারটার দিকে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ময়লা আঁচলের আড়াল হইতে বাহির করিল ময়লা গামছায় বাঁধা একটা পুঁটুলি। সেই পুঁটুলিটা সজোরে সে ছুঁড়িয়া দিল ঘরের মধ্যে। তাহার পর দুম দুম করিয়া চলিয়া গেল। অধিকলাল ঘরের

ভিতর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুঁটুলিতে কি আছে সে তাহা জানিত। তবু আগাইয়া গিয়া খুলিয়া দেখিল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহাই ছিল পুঁটুলির ভিতর। এক ডেলা বুটের ছাতু, তাহার ভিতর একটা কাঁচা লঙ্কা গোঁজা। ছাতুর ডেলাটা হাতে করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। যদিও তাহার ক্ষুধা ছিল না, তবু সে সেটা খাইয়া ফেলিল। তাহার কেমন যেন মনে হইতে লাগিল না খাইলে অন্যায় হইবে।

৪

তপনবাবু অধিকলালকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যতই তাহাকে দেখিতেছিলেন ততই ভালো লাগিতেছিল। স্কুলে খবর লইয়া জানিয়াছিলেন যে সে প্রতি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। অথচ অন্য কাজ করিতেও কম পটু নয়। একদিন সহিস আসে নাই, সেদিন সে ঘোড়ার ঘাসও আনিয়া দিয়াছিল। লাইব্রেরিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গুছাইয়া ফেলিয়াছে। একদিন দেখিলেন বাগানে গাছের গোড়াগুলিও খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতেছে। হকরুরই ইহা করিবার কথা, কিন্তু সে প্রায়ই এ কাজে ফাঁকি দেয়। সকালে নখু এবং তন্নুরও পড়া বলিয়া দেয় অধিকলাল। তাহাদের লইয়া খুব সকালেই পড়িতে বসিয়া যায় সে। নিজের পড়া রাত্রে পড়ে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া। তাহার একটা জীর্ণ লণ্ঠন ছিল। কাচটা ফাটা, চিমনি ধোঁয়ায় কালো। তপনবাবু তাহাকে ভালো একটা আলো কিনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে আর একটা বাসনাও অঙ্কুরিত হইয়াছে। মাইনার স্কুলের হেডমাস্টার হরিপদবাবু একদিন দুঃখ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অধিকলাল

একটি জুয়েল। কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ ওর গুণরাশিকে মলিন করে' দেবে। ওকে 'হাইয়ার এডুকেশন' দেবার ক্ষমতা তো রংলালের নেই। আমাদের দেশে সদাশয় লোকেরও অভাব। বিদ্যাসাগর একটাই জন্মেছিল এ দেশে—"

হরিপদবাবুর এসব কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নাই। তিনি বরাবরই স্বল্পভাষী লোক। কিন্তু তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে একটা সঙ্কল্পের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। তাই রংলাল যখন একদিন তাঁহাকে বলিল—"খুদরু কয়েকদিন থেকে বাড়ি যাচ্ছে না, আপনার এখানেই আছে। আপনি কি ওকে কোনও কাজে বাহাল করেছেন?"

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"হ্যাঁ। ও এখন এইখানেই থাকুক্।"

রংলাল ইহার উত্তরে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মুখ কাচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ তাহার পর মাথা চুলকাইয়া প্রশ্ন করিল—"ওর মা বলছিল ওর 'তলব্' (মাইনে) যদি কিছু ঠিক করে' থাকেন—"

"সেটা ঠিক করেছি। কিন্তু কাউকে বলিনি এখনও। বলবার দরকারও নেই আপাতত—"

রংলালের মুখ আরও কাচুমাচু হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও চলিয়া গেলেন নিজের ডিসপেন্সারিতে। ডিসপেন্সারি হইতে তিনি 'কলে' বাহির হইয়া গেলেন। সমুন্দরি আর সহজে তাঁহার নাগাল পাইল না। কিন্তু সে ছাড়িলও না। সে ভগবতীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"মাইজি আপনি খুদরুবাকে 'যতন করে রেখেছেন এটা তো ওর 'বড়া ভাগ' (মহাভাগ্য), কিন্তু মাইজি, আমরা 'গবিরগুর্বা' 'দুখ-ধান্দা করে' দিন চালাই। ওকে দিয়ে আপনি যত

যত খুশি কাজ করান, ও সব কাজ করতে পারবে, কিন্তু ওর একটা 'তলব্' ঠিক করে দেন। বিনা তলবে ও আপনার বাড়িতে খাটবে কি করে?"

ভগবতী একটু হাসিয়া ভদ্রভাবেই বলিলেন, "কিন্তু আমরা তো ওকে চাকর বাহাল করি নি। ও আমাদের এখানে এসেছে নিরিবিলিতে পড়বে বলে। ও বললে ঘরে ওর পড়বার জায়গা নেই। তাই আমরা ওকে এখানে থাকতে দিয়েছি। কাজকর্ম যা করে তা ও নিজের খুশি মতো করে। আমাদের তো কাজ করবার চাকর আছেই। ও বাড়ির ছেলের মতো আছে এখানে।"

সেদিন কে বললে ও আপনাদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস 'ছিলে' এনেছে। আপনার খোকাবাবু কি ঘোড়ার ঘাস গড়ে?"

"আমার খোকা তো কিছুই পারে না। পড়াশোনাতেও ও কি খুদরুর মতো? খুদরু লেখাপড়াতেও যেমন, কাজকর্মেও তেমন। ছেলে তোমার খুব ভালো। আমরা ওকে 'নোকর' করে বাহাল করি নি, ওর পড়াশোনার সুবিধে হবে বলে' আমাদের লাইব্রেরিতে ওকে থাকতে দিয়েছি।"

"কিন্তু মাইজি, গরীবের ছেলের লেখাপড়া শিখে 'নাফা' কি?"

"অনেক 'নাফা'। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে অনেক উন্নতি হবে। বড় চাকরি হবে, সবাই খাতির করবে—"

"হামাদের মতো গরিবগুর্বাদের তা কি হবে? বড়লোকের ছেলেরাই হাকিম, তাকিম হয়। গরীবের ছেলেরা মেহনতী কাম করে। কুয়া থেকে জল তোলে, বরতন মলে, ঘোড়ার ঘাস 'গড়ে' কুলি মজুর হয় এই তো বরাবর দেখে আসছি মাইজি—"

"সে কাল আর নেই। এখন গরীবের ছেলেরাও লেখাপড়া শিখে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জজ, ব্যারিস্টার, এমন কি মিনিস্টারও হচ্ছে। খুদরু খুব ভালো ছেলে,

বাড়ি থেকে একটা মেঙে (চেয়ে) এনেছে। আমাকে বড় দিক করে। সেইটেই তোমাকে দেব আমি—"

"তা দিও। খুদরুদা কিন্তু যাবে না। আমি যে ওর কাছে পড়ি—"

"কি পড়—"

"অ আ ক খ—"

ভগবতী বলিলেন, "ওদের পড়াবার জন্যে ভূতনাথবাবু আসেন। ওরা কিন্তু খুদরুর কাছে পড়তেই ভালবাসে। দিনরাত তো ওর সঙ্গেই আছে—"

সমুন্দরি অনুভব করিল এখানে আর অধিক সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাহাকে গোলাতে গিয়া এখন অনেক 'গহুম' ফটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হইবে। এ বিষয়ে বোঝা-পড়া করিতে হইলে অধিকলালের সহিতই কথাবার্তা বলা উচিত।

"খুদরুবা কোথা ?"

"লাইব্রেরিতে আছে বোধ হয়। আজ তো ছুটির দিন। ওই-খানেই আছে—"

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুইটি চরণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিল সে।

ডাকে বার বার ডাকে
শোন রে, দুয়ারে দুয়ারে, আঁধারে আলোকে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু অর্থটা তো খুব সরল নয়। আঁধারে আলোকে, দুয়ারে দুয়ারে,—বার বার কে ডাকিতেছে? কেন ডাকিতেছে? সে ডাকের ভাষা কি? তাহা কি কান দিয়া শোনা যায়? কই সে তো শুনিতে পায় না। অথচ ইহাও সে অনুভব করে একটা অবিশ্রান্ত আহ্বান তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জরন করিয়া ফিরিতেছে। সে আহ্বান কাহার, কি করিয়া সে আহ্বানে সে

আমার বিশ্বাস ও যদি পড়বার সুযোগ পায় তাহলে ও অনেক উন্নতি করবে"

"কিন্তু আমার 'মাইজি' ভয় করে। ছেদির ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিন্তু হাকিমও হয় নি 'হুকিমও' হয় নি। হয়েছে একটা বদমাশ লুচ্যা। 'না ঘাটকা, না ঘরকা'। ছেদির মতন বরতনও মলতে পারে না, কোথাও নোকরিও হয় না। গুণ্ডা হয়েছে একটা। তাড়ি খায়, বউকে মারে, আর 'চোরি ডাকাইতি' করে' ফুটানি করে। পাঁড়েজির গোলাতে 'সিন' কেটে চোরি হয়েছিল, শুনেছি ছেদির ব্যাটা পর্মা নাকি সে দলে ছিল। কাল পুলিসে তাকে ধরে' নিয়ে গেছে। লিখা-পড়া শিখার তো এই হালৎ।"

ভগবতী হেসে বললেন, "সবাই কি একরকম হয় নাকি। তুনিয়ায় যে এত চোর বদমাইশ তারা কি সবাই ম্যাট্রিক পাস? তোমার খুদরু খুব ভালো ছেলে হবে, দেখো—"

"না মাইজি। আমার ডর লাগে। গরীবের ছেলে গরীবের মতো মানুষ হওয়াই ভালো। তোমার এখানে পুরি হালুয়া খেয়ে ওর চাল বেড়ে যাবে, তখন ও আমাদের পুছবে না! আমি ওকে আজই বাড়ি নিয়ে যাই।"

তনু এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। এই কথায় সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"না, খুদরুদা যাবে না—"

সমুন্দরি এক মুখ হাসিয়া তুই হাত বাড়াইয়া ডাকিল "আবো খোখি, আব—"

"তুমি খুদরুদাকে নিয়ে যাবে না—"

"আমি যে ওর মা। ও আমার কাছে থাকবে না!"

"না! ও আমাদের কাছে থাকবে। ও আমাকে খরগোশ এনে দেবে বলেছে—"

"খরগোশ আমিই এনে দিব। আজুয়া স্টেশন মাস্টারজির

সাড়া দিবে এই দুরূহ সমস্যায় সে যখন নিমগ্ন তখন আর একটা কবিতার দুইটা লাইন তাহার চোখে পড়িল

আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

আরও সব গোলমাল হইয়া গেল যেন। আপন হ'তে বাহির হওয়া যায় নাকি! গেলেও বাহিরে দাঁড়ানো কি সম্ভব? এ সবের কোনও সদুত্তর তাহার মাথায় আসিতেছিল না। কিন্তু ইহাও সে অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না যে তাহার মনের নেপথ্যলোকে অস্পষ্টভাবে কি যেন একটা রূপ-পরিগ্রহ করিবার আকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। আরও একটা গান চোখে পড়িল—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

এ সবের অর্থ কি? অর্থ যে আছে তাহা তাহার অন্তর্যামী আভাসে অনুভব করিতেছে। কিন্তু—।

"খুদরু— ।"

দ্বারপ্রান্তে সমুন্দরি আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া অধিকলাল হতভম্ব হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

"খুদরুবা—"

গীতবিতান আলমারিতে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল অধিকলাল।

"কি বলছ—"

"তোমার ব্যাপার কি? তুমি দিনরাত এখানে পড়ে' আছ কেন?"

"এখানে আমি নোকরি করি।"

"নোকরি কর? 'তলব' কত?"

"তলব টাকায় পাই না। কিন্তু এমন একটা ভাঁলো ঘর পেয়েছি পড়াশোনা করবার জন্য। মাইজি খেতেও দেন। এটাই কি কম?"

“এতে আমাদের কি ‘নাফা’। রামদাসের বেটা ভুট্টা রোজ জাহাজঘাটে কুলিগিরি করে’ মায়ের হাতে নগদ পয়সা এনে দেয় কোনদিন এক টাকা কোনদিন দেড় টাকা।”

“আমি সে সব পারব না। রামগোবিনের পায়ে তেল দিয়ে কুলিগিরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

“তুমি কি করবে তাহলে—”

“আমি পড়ব।”

“পড়বে? পড়ে’ তোমার কি ‘পুছড়ি’ (ল্যাজ) বেরুবে, না দশটা হাত গজাবে?”

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টিতে একটা কুৎসিত ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। অধিকলাল কোন উত্তর দিল না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। হিংস্র দৃষ্টিতে সমুন্দরি চাহিয়া রহিল সেই বদ্ধ দ্বারের দিকে। তাহার পর আগাইয়া গিয়া কপাটে দুম দুম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

“কপাট খুলবি কি না”

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কপাটে আরও কয়েকবার ধাক্কা মারিল সমুন্দরি। কিন্তু বদ্ধদ্বার খুলিল না। যদি খুলিত সমুন্দরি দেখিতে পাইত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অধিকলাল কাঁদিতেছে।

৫

কয়েক দিন পরে রামগোবিন শাস্ত্রী আসিয়া তপনবাবুকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিল। রামগোবিন যখন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে চাকরি করিত তখন দরকার পড়িলে (অর্থাৎ হকরু অন্তর্ধান করিলে) তপন-

বাবুর বাড়িতেও তাহাকে চাকরের কাজ করিতে হইত। এখন ব্যবসায় করিয়া সে প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছে কিন্তু সে যে একদিন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ করিয়াছিল একথা সে ভোলে নাই। ইহাও সে মনে মনে সন্দেহ করিত যে তাহার এই ব্যবসায়ের ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত তাহা আর কেহ না জানুন ডাক্তারবাবু জানেন। তিনি এ অঞ্চলে অনেক দিন হইতে ডাক্তারি করিতেছেন, সকলের সহিতই তাঁহার পরিচয় আছে, এখানকার স্টেশন মাস্টার দারোগা, পোস্টমাস্টর, জমিদারের আমলারা সকলেই তাঁহার পরিচিত। সুতরাং রামগোবিনের আঙুল-ফুলিয়া-কলা-গাছ-হওয়ার রহস্যটা নিশ্চয়ই তাঁহার অবিদিত নাই। তাছাড়া রামগোবিনও বহুভাবে তাঁহার নিকট উপকৃত। এখনও তিনি বিনা পয়সায় তাহার চিকিৎসা করেন। এই সব কারণে রামগোবিন যখনই তপনবাবুর নিকটে আসে তখনই তাহার চোখে মুখে একটা ভিজা-বিড়াল গোছ ভাব ফুটিয়া ওঠে।

সে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তপনবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি শাস্ত্রীজি, খবর কি তোমার। ব্যবসাপত্তর ভাল চলছে তো ?"

"হাঁ হুজুর। আপনার আশীর্বাদে চলে' যাচ্ছে একরকম"

"অনেকদিন পরে এসেছ আজকে। কোনও দরকার আছে না কি ?"

"জি হুজুর। ওই খুদরুবার ওয়াস্তে (জন্যে) এসেছি। ওর মা—রংলালের জেনানি সমুন্দরি—বড় হাল্লা মাচাচ্ছে—"

"কেন, কি ব্যাপার ?"

"খুদরুবা খুব তেজ লেড়কা। ওর কাছে আমি অছ্ছর (অক্ষর) শিখেছি। ওকে আমি গুরুজি বলি। তাই আমি সমুন্দরিকে বলেছিলাম ও যদি আমার ছেলে যোগীনাথকে পঢ়ায় তাহলে ওকে

আমি মাসে পন্‌দ্‌রহ (পনেরো) রুপিয়া কোরে তলব দিব। সমুন্দরি তখন বললে ও আপনার ছেলেমেয়েকে নাকি পঢ়ায়—তখন আমি বললাম—তাহলে আমি ওর ভিতর পড়ব না—"

তপনবাবু বলিলেন, "না, খুদরু তো আমার ছেলেমেয়েকে পড়ায় না। ভূতনাথবাবু ওদের পড়ান। তিনি খুদরুকেও পড়িয়ে দেন—"

"তাহলে খুদরুকে আমি বহাল করতে পারি কি ?"

"খুদরু যাবে না। সে পড়তে চায়—"

"আপনার বাড়িতে থাকে কেন ?"

"একদিন এসে আমাকে বললে আমার পড়বার জায়গা নেই বাড়িতে, তাই আমি গাছতলায় বসে' পড়ছিলাম, নখু আর তন্নু আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি তখন বললাম বেশ তুমি এখানেই থাক, আমার লাইব্রেরি ঘরটা খালি পড়ে' থাকে সেইটেকেই তুমি তোমার পড়ার ঘর কর। সেই থেকেই ও আছে এখানে। নখুর মা ওকে খেতে টেতেও দেয় তাই আর বাড়ি যাওয়ার দরকার হয় না ওর।"

রামগোবিন হাতজোড় করিয়া চোখ বুজিয়া শুনিল সব। তাহার পর বলিল—"আপনি হুজুর মহাত্‌মা লোক, বড়া আদমী। আমরা সব 'মুরুখ্' (মূর্খ)—তবু একঠো বাত আপনাকে বলছি। দুব্‌রি (দূর্বা) কখনও পিপর (বট) হবে না। খুদরু হচ্ছে দুব্‌রির জাত তাকে পিপর করবার চেষ্টা করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। দুব্‌রি দুব্‌রিই থাকবে কভি (কখনও) পিপর হোবে না। আপনি ওকে ছোড়িয়ে (ছেড়ে) দিন।"

তপনবাবু হাসিয়া বললেন,—"আমি তো ওকে জোর করে' ধরে' রাখি নি। ও নিজেই এসেছিল, আমি ওকে থাকতে দিয়েছি। এখন বলতে পারি না তুমি চলে' যাও। ছেলেটি সব দিক থেকেই ভালো। ওর সঙ্গে অভদ্রতা করব কি করে' ? ও নিজে যদি চলে'

যায় আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দিতে পারব না আমি। ডুব্‌রি আর পিপরের যে উপমাটা তুমি দিলে মানুষের বেলায় তা খাটে না। মানুষের বেলায় অনেক 'ডুব্‌রি' 'পিপর' হয়েছে এ কথা অনেকেই জানে। তোমার কথাই ধর না, তুমিও তো 'ডুবরি ছিলে, এখন কত বড় হয়েছ। যদি লেখাপড়া জানতে আরও বড় হ'তে। আমার বিশ্বাস খুদরু অনেক বড় হবে—"

রামগোবিন হাতজোড় করিয়া নীরব রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"আর একটা 'বাত' আছে ডাক্তারবাবু। ও দিনরাত এখানে পড়ে' থাকে, মা বাপের কাছে একবারও যায় না। ওর মায়ের বুকে বড় 'চোট্' লাগে এজন্য। হাজার হোক ছেলে তো—"

"আচ্ছা, আমি ওকে বলে' দেব মায়ের কাছে রোজ যেন যায়। আসল কথা কি জান রামগোবিন, এসব জিনিস জোর জবরদস্তি করে' হয় না, মায়ের কাছে ছেলে যাচ্ছে না, এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, কারণটা কি তা' আমরা জানি না, অনেক সময় বাইরে থেকে সেটা বোঝাও যায় না, কিন্তু কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, আমি ওকে বলে' দেব, মায়ের কাছে যেন ও যায়।"

রামগোবিন দেখিল ডাক্তারবাবু যাহা বলিতেছেন তাহা 'ওয়াজিব', সুতরাং যুক্তি দিয়া তাহা খণ্ডন করা যাইবে না। আর একটা কথা তাহার মনে হইল, সেইটাই বলিল সে।

"খুদরু লেখাপড়া শিখলে হয়তো বড় হবে। কিন্তু ওকে পড়াবে কে। কলেজের পাস না হলে তো 'উঁচা-দরজার 'কাম' পাবে না। কিন্তু ও রংলালের ছেলে, ওকে পড়াবে কে, বলুন ?"

"ভালো ছেলেরা অনেক সময় 'জলপানি' পায়, অনেক সময় তাদের মাইনেও মাপ হয়ে যায়। এর উপর কেউ যদি সামান্য কিছু খরচ করে' ওকে সাহায্য করে তাহলেই হ'য়ে যাবে—"

"কিন্তু কে করবে, সেই তো মুশকিল—"

"রংলাল তোমার বন্ধু, এখন তোমার গোলায় চাকরি করে, ভগবানের দয়ায় তোমার ব্যবসাও ভালো চলছে, তুমিই ইচ্ছে করলে ওকে সাহায্য করতে পার। এই ভালো কাজটি করলে ভগবান তোমার ভালো করবেন, খুদরুও চিরকাল তোমার গুণ গাইবে, সুযোগ পেলে তোমাকে সাহায্যও করবে—"

রামগোবিন যদিও বলিয়া উঠিল, "ই তো ঠিক বাত, ই তো ঠিক বাত"—কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একটু বেকায়দায় পড়িয়া গেল।

তপনবাবু বলিলেন—"দেখো রামগোবিন, ভগবান কাকে যে কখন কিভাবে সাহায্য করেন তা আমরা বলতে পারি না। তাই খুদরুকে পরে কে পড়াবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই এখন। ও এখান থেকে পরীক্ষাটা তো আগে পাস করুক, তারপর দেখা যাবে।"

রামগোবিনকে এ কথাতেও সায় দিতে হইল। ইহার পর কিন্তু সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। ডাক্তারবাবু আবার তাহাকে কি প্যাঁচে ফেলিয়া দিবেন কে জানে। রংলালের ব্যাটা খুদরুবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিতে হইলেই তো হইয়াছে! অথচ ইহাও সে মনে মনে জানে যে ডাক্তারবাবু যদি জিদ ধরিয়া বসেন তাহাকে দিতেই হইবে। ডাক্তারবাবুর কথা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার নাই।

ডাক্তারবাবুর কথায় খুদরু তাহার পর দিনই সকালে তাহার মায়ের সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল তাহার মা ছাতু পিষিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মা যে ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিল সে ভাষায় সে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত। এই তীক্ষ্ণ ছেকা-ছিনি ভাষা গালাগালিতে শ্লেষে ব্যঙ্গে অতিশয় সমৃদ্ধ। সমুন্দরি অধিকলালের দিকে একনজর চাহিয়া দেখিল তাহার পর শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"কি রে বড়া

আদমীর কুত্তা। এখানে এসেছিস কেন। 'লাত' (লাথি) মেরে তাড়িয়ে দিলে না কি—।"

যে সমাজে তাহার জন্ম সে সমাজে এই ধরনের ভাষাতেই সকলে কথা কয়। অধিকলাল এ ধরনের ভাষা অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। আজ সে সহসা বিস্মিত হইল। আজ সে সহসা উপলব্ধি করিল তাহার এবং তাহার মায়ের মাঝখানে একটা দুস্তর নদী যেন বহিয়া চলিয়াছে। সে নদী পার হওয়া শক্ত, পার হইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। এই কয়দিনে শুধু তাহার বাহিরের চেহারা নয়, মনের চেহারাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ভগবতী তাহাকে আলাদা একটি সাবান দিয়াছেন, চিরুনিও দিয়াছেন। তাহাকে রোজ নিজের জামা-কাপড়ে সাবান দিতে হয়, মাথা আঁচড়াইয়া মাথা পরিষ্কার করিতে হয়। নিজেই তিনি একদিন তাহার মাথা আঁচড়াইয়া উকুন বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—দেখ, তোর মাথায় কত 'ঢিলা' (উকুন) আছে। রোজ যদি ভাল করে' আঁচড়াস সব চলে' যাবে। তাহাদের সকলের মাথাতেই 'ঢিলা' আছে এ কথা সে জানে, তাহার মা-ও জানে, কিন্তু তাহার মা ইহা লইয়া কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করে নাই। মাঝে মাঝে তাহার মা তাহার বোনদের এবং ছোট ভাইটাকে লইয়া পড়ে, তাহাদের মাথা হইতে 'ঢিলা' 'চুনিয়া' সেগুলি পুটপুট মারিয়া ফেলে। সে যখন ছোট ছিল তখন তাহারও মাথা হইতে সমুন্দুরি ঢিলা বাছিয়াছে। কালুয়ার মায়ের সহিত পরনিন্দা এবং পরচর্চা করিতে করিতে এই ধরনের অবসর-বিনোদনের বহু চিত্র তাহার মনে আঁকা আছে। কিন্তু ইহার সহিত ভগবতী দেবীর স-স্নেহ সভ্য আচরণের তফাৎ যে কতটা—টুকটুকে লাল যে সরু চিরুনিটি তিনি তাহাকে দিয়াছেন তাহার পিছনে বর্ণবহুল যে সংস্কৃতির আভাস সে দেখিতে পাইয়াছে—তাহার মূল্য যে কি তাহা সে

বুঝিতে ভুল করে নাই। কিন্তু তবু—। হ্যাঁ, তবু। ডাক্তারবাবুর কথাগুলি তাহার মনে পড়িল—তবু ওই তোমার মা। ওর মনে কষ্ট দিলে তোমার পাপ হইবে। মায়ের আশীর্বাদ না পাইলে জীবনে বড় হইতে পারিবে না। মা-বাবাকে খুশী রাখিতে হইবে। আমার এখানে থাকিয়া তুমি লেখাপড়া কর। আমার এখানে খাওয়া-দাওয়াও কর। কিন্তু মা-বাবার মনে দুঃখ দিও না। তুমি রোজ সকালে গিয়া মা-বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিবে। মা যাহা খাইতে দিবে তাহা খাইবে। লোকে যেন না মনে করে আমি তোমার মা-বাবার নিকট হইতে তোমাকে ছিনাইয়া আনিয়াছি। তাহা করিবার মোটেই ইচ্ছা নাই আমার। সন্তানকে মা-বাবার নিকট হইতে কাড়িয়া আনিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না। তুমি বড় হও, কিন্তু মা-বাবার সহিত সংস্রব ছিন্ন করিও না।'

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

"ই কি ঢং ছে—।" (এ আবার কি ঢং।) সমুন্দরি অবাক হইয়া তাহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রংলাল জাহাজ-ঘাটে কুলি খাটাইতেছিল। সে-ও অবাক হইয়া গেল যখন অধিকলাল তাহাকে প্রণাম করিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। তাহার মনে হইল—এ কি ব্যাপার! ছেলেটার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি।

৬

পৃথিবীতে সব অনিবার্য ঘটনাকে মানুষ শেষ পর্যন্ত মানিয়া লয়। ভূমিকম্প, ঝড় বা বন্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই ইহা সবাই জানে। গভীর শোকও মানুষ সহ্য করে। আমরা

প্রথম প্রথম কষ্টে কাতর হই বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কষ্টের তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে। অধিকলালের সহিত যখন তাহার মা-বাবার সম্বন্ধ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া আসিতে লাগিল, যখন তাহারা বুঝিল যে অধিকলাল কিছুতেই তাহাদের মতো আর 'জনমজুরি কামাইবে' না, সে 'বাবুভেইয়া'দের দলে গিয়া মিশিয়াছে, 'অংরেজি' শিখিয়া হাকিম বনিবার ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আর এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর মতো লোক যখন তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তখন ব্যাপারটাকে তাহারা মানিয়াই লইল। রংলাল ভাবিল অধিকলাল যদি মরিয়াই যাইত, (ছোটনের অতবড় ছেলেটা তো মাঠে গরু চরাইতে গিয়া সাপের কামড়ে মারা গেল,) কিংবা যদি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত (বিশুর বড় ব্যাটা ঘিসু একটা আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না)—এসব হইলে কি করিত সে? কিছুই করিত না। এখন বরং অধিকলালকে সে চোখের সামনে দেখিতে পায়। প্রণাম করিবার জন্য কাছেও আসে একবার।

এই প্রণাম রহস্যটা সে সমাধান করিয়াছে। অবশেষে ডাক্তারবাবুর আদেশেই অধিকলাল রোজ প্রণাম করিতে আসে। ইহাতে ডাক্তারবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। সমুন্দরির মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ। সে দ্বিতীয় দিনই অধিকলালকে এক ধমকে ভাগাইয়া দিয়াছিল। ওসব ঢং তাহার ভালো লাগে না। নিজের ছেলে পর হইয়া গিয়া এখন 'পরনামের' ভড়ং করিতে আসিয়াছে। অধিকলাল কিন্তু অত সহজে ভাগে নাই। বরং সে একটা মজা পাইয়া গিয়াছিল যেন। সে রোজ উঠানে ঢুকিয়া দূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলে "পরনাম মাই—"। সঙ্গে সঙ্গে সমুন্দরি মুখে গালির তুবড়ি ছুটাইয়া তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে না। সে যখন

নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় তখন সমুন্দরির মুখেও একটা হাসি ফোটে। এমন কি সে রোজ মনে মনে প্রতীক্ষাও করে খুদরুবা প্রণামের 'ঢং' করিতে কখন আসিবে।

মোট কথা খুদরুবা যে তাহাদের ছাড়িয়া তপনবাবুর বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছে, তাহার চাল-চলন কথা-বার্তা 'রহন-সহন' এমন কি চেহারাটাও যে বাঙালীবাবুদের মতো হইয়া গিয়াছে এই সত্যটা সমুন্দরির কাছে প্রথমটা যত মর্মান্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন ততটা মর্মান্তিক আর নাই। রংলালের নিকট কোনদিনই ইহা ততটা দুঃখদায়ক ছিল না। সে সরল মানুষ। সে বুঝিয়া লইয়াছিল ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য করেন। খুদরুর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। ডাক্তারবাবুর মতো লোকের নজরে যখন সে পড়িয়াছে তখন ভালই হইবে আশা করা যায়।

খুদরুবা নিশ্চিন্ত চিত্তে পড়াশোনায় মন দিল। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাহাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবসর পাইলেই সে রবীন্দ্রনাথের বই লইয়া বসিত। সেদিন সে তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল ঃ

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলাসরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ-হৃদয়-হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলুকুলু স্বর
ফুটে অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মানিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে

সব কথার অর্থ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। কিন্তু ছন্দের

সুরে সে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দায় ধুপধাপ শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তাহার সুর কাটিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থলিয়া এবং তিলিয়া—তাহার দুই বোন—দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উঁকি দিল।

"তোরা কি করছিস এখানে—"

খুদরু বাহির হইয়া আসিল। দেখিল স্থলিয়া আর তিলিয়া তনুর দুইটি পুরাতন ফ্রক গায়ে দিয়াছে। অদূরে আজুয়াও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার গায়ে নখুর একটি পুরাতন কামিজ। তিলিয়া একমুখ হাসিয়া তাহার ফ্রকটি দেখাইয়া বলিল—'মাইজি দেলকে'। একটু পরে সমুন্দরিও বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—চল্, ঘর চল্। খুদরুর কান দুইটি গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমুন্দরির দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি মাইজির কাছে ভিখ মাংতে এসেছিলে নাকি!" সমুন্দরি ছেকাছেনি ভাষায় যে জবাব দিল তাহা বেশ ঝাঁঝালো। তাহার মর্ম—'আমার সমর্থ ছেলে আমাদের দিকে ফিরে তাকায় না। বড়লোকের দেওয়া কাপড় জামা পরে, বড়লোকের বাড়িতে থেকে অংরেজি পড়ছে, নিজের আখের দেখছে, আমাদের দিকে, নিজের ভাইবোনদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমার কপাল পোড়া, তাই আমাকে 'ভিখমাংনি' (ভিখারিনী) হতে হয়েছে—চল্, চল্—ঘর চল্—

গরু ছাগলকে লোকে যেমন করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যায় সমুন্দরি তিলিয়া স্থলিয়া এবং আজুয়াকে তেমনিভাবে তাড়াইয়া লইয়া গেল। যাইবার পূর্বে সে খুদরুবার দিকে যে দৃষ্টি হানিয়া গেল তাহা অগ্নিগর্ভ। সে দৃষ্টির ভাষা কথায় অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু তাহা মর্মে গিয়া মর্মান্তিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা হইতেই সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছে—

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহু দূর দেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথ শেষে,
কোন দুঃখে কাঁদে প্রাণ? কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধ নেত্র মেলি? কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে?

* * *

মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দুধারে
গ্রহ-তারকার দীপ কাতারে কাতারে।

অদ্ভুত একটা আনন্দ পাইল সে। অদ্ভুত একটা বিস্ময়। সত্যই সে যেন পথের দুধারে গ্রহ-তারকার দীপালিকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

সেই বছরই অধিকলাল সসম্মানে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল সে। মাসিক চার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইল। তপনবাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন সে নাকি রেকর্ড মার্ক পাইয়াছে। তপনবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। তিনি এই উপলক্ষে স্কুলে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় গ্রামের গণ্যমান্য সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বিশেষ লোক সমাগম নাই। রামগোবিনের চাকর রংলালের পুত্র অধিকলালকে অভিনন্দিত করিতে কেহ ব্যগ্র নহে। যাহাদের আমরা ছোটলোক বলি তাহারাই আসিয়াছিল বেশী। অধিকলালের জাত-ভাইরাই পাড়া ঝাঁটাইয়া আসিয়াছিল এবং মাটির উপর আসিয়া বসিয়াছিল। চেয়ারগুলি সব প্রায় খালিই পড়িয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকগণ অবশ্য ছিলেন। তপনবাবু আশা

করিয়াছিলেন রামগোবিন অন্ততঃ আসিবে। কিন্তু সেও আসে নাই। ডাক্তারবাবু অধিকলালকে, কিছু বাংলা এবং কিছু ইংরেজি বই উপহার দিলেন। বাংলা বইগুলি সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের বই। অধিকলাল যে রবীন্দ্রনাথের বই পড়িতে ভালবাসে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকরাও সকলে অধিকলালের খুব প্রশংসা করিলেন। ডাক্তারবাবু পরিশেষে যাহা বলিলেন তাহাতে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। তিনি গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমাদের অধিকলাল তোমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু সে গরীবের ছেলে, বেশী দূর পড়িবার সঙ্গতি তাহার নাই, গ্রামের লোকেদের উচিত তাহার পড়ার ব্যবস্থা করা। আপনারা সকলে যদি চাঁদা করিয়া তাহার নামে পোস্টাফিসে কিছু টাকা জমা করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভালো হয়। আমি নিজে একশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সকলেই উসখুস করিতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ দুই টাকা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তপনবাবু নিজের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া একটি মালাও গাঁথিয়া অধিকলালকে উপহার দিয়াছিলেন। মালাটি গাঁথিয়াছিল তনু। সেই মালাটি পরিয়া এবং বইগুলি লইয়া সভার একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল অধিকলাল। সে সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমুন্দরির কাছে চলিয়া গেল। সমুন্দরি পিছনে ভিড়ের মধ্যে মাটিতে বসিয়াছিল। অধিকলাল সেখানে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া গলার ফুলের মালা এবং বইগুলি তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—মা, এই লে। হম্ আর নেহি পঢ়বো। হামরা ওয়াস্তে কাম খোজ্। তাহার পর সভার ভিতর আসিয়া ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তা কেউ করে নি। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ

করতে পারব না। তবে আমি একটা জিনিস ঠিক করে' ফেলেছি, ভিক্ষার টাকা দিয়ে আমি পড়ব না। আমি রোজগার করতে আরম্ভ করব, যদি কিছু জমাতে পারি, তাহালেই পড়ব আবার। আমার মা বাবা যদি আমাকে পড়াতেন তাহলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাঁরা গরীব, তাঁরা—"

হঠাৎ অধিকলালের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না। টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

৭

খুদরু ভোরে সোজা জাহাজঘাটে গিয়া রামগোবিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি আর পড়ব না, আমাকে কোনও কাজ দিন।"

"আমি আগেই জানতাম পড়াশোনা করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। বেশ, তুমি যোগীনাথকে পড়াও। পনর টাকা মাইনে দেব—"

"ও কাজ আমি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন। আপনার কামতের কাজ—"

"কামতে অন্য লোক আছে। কুলির কাজ তুমি করতে পারবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থেকে তুমি 'বাবু' হয়ে গেছ। ভারি ভারি মাল বওয়া তোমার কর্ম নয়। অন্য কি কাজ দেব তোমাকে?"

জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িয়াছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল অনেক। খুদরু সেই দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সে একটি প্যাসেঞ্জারের স্যুটকেস ও বিছানা মাথায় লইয়া আসিতেছে।

রামগোবিন পাগড়ি পরিয়া ট্রেনের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। খুদরুকে দেখিয়া সে হাত উলটাইয়া বলিল—"ই ছোকরাকা দিমাক (মাথা) খারাব হো গিয়া মালুম হোতা হ্যায়—রে খুদরুবা শুন শুন ইধর শুন—"

খুদরু কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। একজন প্যাসেঞ্জারের মাল ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আবার জাহাজের দিকে ছুটিল সে।

হঠাৎ রামগোবিনের নজরে পড়িল সমুন্দরি কিছু ছাতু এবং মুড়ির মোয়া লইয়া স্টেশনের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে —'সাত্তু সাত্তু বুটকা সাত্তু—লাড্ডু লাড্ডু মুড়িকে লাড্ডু'। সমুন্দরি মাঝে মাঝে স্টেশনের ধারে বসিয়া নিজের হাতে-পেষা ছাতু এবং নিজের হাতের তৈরী মোয়া বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা উপার্জন করে।

রামগোবিন তাহার দিকে আগাইয়া বলিল, "তোর ব্যাটার কাণ্ড দেখেছিস। কুলিগিরি করছে। ওই দেখ—"

সমুন্দরি দেখিল খুদরুবা প্রকাণ্ড একটা বিছানা ঘাড়ে বহিয়া আনিতেছে। হাতে একটা প্রকাণ্ড টিফিন কেরিয়ার। বিছানার ভারে ঘাড়টা বাঁকিয়া পড়িয়াছে বেচারার। কতই বা বয়স। মাত্র চোদ্দ বৎসর।

রামগোবিন টিপ্পনী কাটিল একটা। অন্য উপমা ব্যবহার করিল এবার। তপনবাবুকে 'তুবরি' এবং 'পিপর' গাছের কথা বলিয়াছিল সমুন্দরিকে বলিল, " 'শিয়ার' (শৃগাল) কভি 'সিং' (সিংহ) নেহি হোগা—ই তো হাম্ পহলেই কহা থা—"। (শৃগাল কখনও সিংহ হবে না, এ তো আমি আগেই বলেছিলাম)।

সমুন্দরি এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সোজা খুদরুবার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘাড় হইতে বিছানাটা এক ঝটকায় নীচে ফেলিয়া দিল "ছোড় ই সব। ঘর যো—"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোক পিছনেই ছিলেন, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেই সমুন্দরি তাঁহাকেও এক ধমক দিল। "ছোটা বুতরুকা (বাচ্চার) শিরপর কোন আকিল সে এতনা বড়া বোঝা লাদ দিয়া বাবু!" তাহার পর নিজেই সে বিছানাটা কাঁধে করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। টিফিন কেরিয়ারটা লইয়া খুদরুবা গাড়িতে উঠিয়াছিল। সেটাও তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আবার বলিল—যো তু ঘর যো! খুদরুবা নামিয়া গেল। প্যাসেঞ্জার বাবুটি চার আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সমুন্দরি। চার আনা পয়সা! অত ভারি বোঝার জন্য মোটে চার আনা।

"ওর সঙ্গে তো চার আনাই কড়ার হয়েছিল—"

"ও তো বুতরু। ও কি জানে। ও লিখাপড়ি জানে। ও কি কুলির কাম কোনও দিন করিয়েসে?"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে বাঙালী দেখিয়া সমুন্দরি বাংলা ভাষাতেই কথা বলা সঙ্গত মনে করিল।

"ছ আনা পয়সা লাগবে বাবু। ওহি রেট—"

খুদরুবা নীচে হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল যে সে চার আনা পয়সাতেই রাজী হইয়াছিল।

"চুপ র—"

এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিল সমুন্দরি।

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে শেষে ছ' আনাই দিতে হইল। পয়সাটি নিজের আঁচলে গিঁট দিয়া বাঁধিয়া সমুন্দরি ট্রেন হইতে নীচে নামিল। খুদরুবা তখনও ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

"কুছ খাইলো ছে?"

(কিছু খেয়েছিস?)

খুদরুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল কিছু খায় নাই। বলিল সে খুব

ভোরে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মাইজির তখনও ঘুম ভাঙে নাই। সমুন্দরি তখন দুইটি মুড়ির লাড়ু আনিয়া তাহার হাতে দিল।

"খো। অব ঘর যা—"

খুদরুবা কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, আর পড়িবে না, সে গরীব, পড়িতে হইলে যে পয়সা চাই সে পয়সা সে ভিক্ষা করিয়া আহরণ করিবে না। সুতরাং আজ হইতেই সে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। সমুন্দরির দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

"হাম কহৈছি, তু ঘর যো—"

(আমি বলছি তুই বাড়ি যা)

খুদরুবা তবু দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিবে না সে। তাহার লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে।

"কোন চিজ কে লাজ ?"

(কিসের জন্য লজ্জা ?)

খুদরুবা কোনও উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার চক্ষু দুইটি আবার সজল হইয়া আসিল। সমুন্দরি নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর গালে হাত দিয়া বলিল—"দেখো, তামাসা দেখো, কি ভেলে তোরা ?" (দেখ কাণ্ডখানা। কি হল তোর ?) খুদরুদা সহসা মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিল। দেখিতে দেখিতে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে হারাইয়া গেল সে। সমুন্দরি হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষন। তাহার পর ছাতুর টুকরিটা মাথায় তুলিয়া সেও বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। আবার তাহার দেখা হইল রামগোবিনের সঙ্গে। রামগোবিন খুদরুবাকে ভিড়ের মধ্যে দ্রুতপদে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহার মনে হইয়াছিল ছোকরা রণে ভঙ্গ দিয়া বুঝি পলায়ন করিতেছে,

হুঁ হুঁ কুলিগিরি করা অত সহজ নয়। সমুন্দরিকে দেখিয়া সে বলিল, "শিয়ারোয়া উধর ভাগলো। ফের আইতে। বন্‌কা গিদড় ভাগে কা কিধর—"

(শিয়ালটা ওই দিকে পালাল। ফের আসিবে। বনের শিয়াল যাবে কোথা)।

সমুন্দরির চক্ষু দুইটি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শিয়ার শিয়ার কাহে করৈছ। উ সিং হোতে, দেখিও"

(শিয়াল শিয়াল করছ কেন। ও সিংহই হবে দেখো) সমুন্দরি হনহন করিয়া চলিয়া গেল। রামগোবিন থতমত খাইয়া গেল একটু। সে ধনী হইয়াছে বটে কিন্তু মজুরনী সমুন্দরিকে সে ভয় করে। মানুষ তো নয়, যেন একটা ইনজিন্।

খুদরুবা জাহাজঘাট হইতে গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া পথে পথে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার খুব ইচ্ছা করিতেছিল আবার সে তাহার লাইব্রেরি ঘরটিতে ফিরিয়া যায়, আবার রবীন্দ্র-নাথের একখানা বই খুলিয়া বসে, আবার তনুকে তাহার পড়া বলিয়া দেয়, কিন্তু—হ্যাঁ ওই কিন্তুটাই তাহাকে যাইতে দিতেছে না। তাহার বার বার মনে হইতেছিল ও বাড়িতে যাইবার অধিকার তাহার আছে কি? ওখানে সে বেমানান। হঠাৎ হকরুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আরে খুদুরবা, চল, মাইজি বোলাইছে—"

(আরে খুদুরুবা, চল, মাইজি ডাকছে)

খুদরুবা বলিতে পারিল না, আমি যাইব না। নীরবে হকরুর অনুসরণ করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল দারিদ্র্যের জন্য লজ্জা কি? দারিদ্র্য তো পাপ নয়। হঠাৎ তাহার আব্রাহাম্ লিংকনের জীবনী মনে পড়িল। কয়েকদিন আগেই লিংকনের জীবনী

পড়িয়াছে সে। কি গভীর দুঃখের জীবন ছিল তাহার। সে তুলনায় তো সে রাজার হালে আছে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিতেই তনু ছুটিয়া আসিল। সে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ।

"খুদরুদা তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমরা চারদিকে তোমাকে খুঁজছি তখন থেকে। জান, মা আজ 'চপ' ভেজেছে। চল খাবে চল। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়। আর জান খুদরুদা, লাইব্রেরি ঘরের বারান্দায় শালিক বোধহয় বাসা তৈরি করছে। দুটো শালিক খড়কুটো মুখে নিয়ে ওই জানলার উপরে দেওয়ালে যে ফাঁকটা আছে সেইখানে ঢুকছে। বাচ্চা হলে বেশ মজা হবে, না? আমাকে একটা খাঁচা এনে দিও, কেমন?"

অধিকলাল কোনও উত্তর দিতেছিল না, তনুর ইচ্ছা করিতেছিল তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিতে। কিন্তু তাহার মা অধিক-লালের গায়ে হাত দিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। এ সব বিষয়ে ভগবতী দেবীর খুব কড়া নজর।

একটু পরে নখুও আসিয়া হাজির হইল। সে ঘরের ভিতর ছিল।

"খুদরুদা কোথায় ছিলে তুমি—"

খুদরু একটু মুচকি হাসিল কোন উত্তর দিল না।

"বল না, ভোরে উঠেই কোথা গিয়েছিলে?"

খুদরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল—"আমি জাহাজঘাটে গিয়েছিলাম কাজ খুঁজতে। আমার পড়া তো শেষ হয়ে গেল, আর পড়া তো হবে না। তোমাদের বাড়িতে থেকে কি হবে আর—তাই—"

"তোমার পড়া হবে না কে বললে। বাবা বলেছেন সে ব্যবস্থা করবেন। তুমি সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়বে বোর্ডিংয়ে থেকে—চল না তুমি বাড়ির ভিতর—"

তন্নু শোরগোল তুলিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া চলিয়া গেল—"মা খুদরুদা এসেছে। তুমি ওকে বকে দাও—ও বলছে আর পড়বে না"

তপনবাবু তখনও কলে বাহির হইয়া যান নাই। তিনি খুদরুকে দেখিয়া বলিলেন—"কোথায় ছিলে তুমি সকাল থেকে? তুমি আজ বিকেলের ট্রেনেই সাহেবগঞ্জে চলে' গিয়ে সেখানকার স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ভরতি হয়ে যাও। সেখানকার হেডমাস্টারমশাই আমার চেনা লোক, তাঁর নামে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব—"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—"কিন্তু আমি বোর্ডিংয়ের খরচ তো চালাতে পারব না।"

"সে জন্যে তোমার ভাবনা কি, তার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আজই বিকেলে চলে যাও—"

অধিকলাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনার টাকায় আমি পড়ব না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন—"

আবার চুপ করিয়া গেল। ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আগাইয়া আসিয়া স-স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তোর হয়েছে কি বল দেখি। তুই এতদিন আমাদের কাছে রইলি, এতদিনেও তুই আমাদের আপনার লোক হলি না? তুই যদি আমার বড় ছেলে হতিস তাহলে কি তোকে আমরা পড়াতাম না? পয়সার অভাবে তোর মতন ভালো ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এ কখনও হ'তে পারে! মাসে দশ টাকা করে' দিলেই তোর বোর্ডিংয়ের খরচ চলে যাবে। সে দশ টাকা কেউ না দেয় আমি দেব—"

অধিকলাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবতী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"মাইজি—"

উঠানের একপ্রান্তে সমুন্দরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ভগবতী দেবী বাহির হইয়া দেখিলেন সমুন্দরি একটা ট্রাংক মাথায় বহিয়া আনিয়াছে।

"কি সমুন্দরি ও ট্রাংক কার?"

"হামার"

সমুন্দরি অতি কষ্টে ট্রাংকটা বারান্দার উপর নামাইল। তাহার পর অধিকলালের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—ওই ছোঁড়াপুতাটা (ছোঁড়াটা) আজ জাহাজ-ঘাটে কুলির কাজ করতে গিয়েছিল। কাল আপনারা দশজনকে ডেকে ওকে কত খাতির করলেন, আজ সকালে ওর এই বুদ্ধি। বলছে আমি ভিখ মেঙে (ভিক্ষে করে') পড়ব না, আমি কুলিগিরি করব। জানেন মাইজি, কুত্তার তুম্ (কুকুরের লেজ) কখনও সিধা (সোজা) হয় না। মগর (কিন্তু) আমি ওকে সিধা করব। তাই এই "পেটারি" (ট্রাংক) ঢুয়ে (বয়ে) নিয়ে এসেছি। হামার 'যমানি উমার' (যৌবন কাল) থেকে 'যেতো' (যত) 'জেবর' (গহনা) গড়িয়েছি সব ওই পেটারির ভিতর আছে। হাজার ভরির কম হবে না। সব চাঁদির (রূপার) জেবর। তাছাড়া আছে পাঁচশ টাকা নগদ। আমি 'সোভই' (সবই) ওই ছোঁড়াপুতার হাতে দিয়ে দিচ্ছি, কারো কাছে তোকে ভিখ মাংতে হোবে না, তুই কত পড়বি পড়।

এই কথাগুলি বলিয়া সমুন্দরি স্পর্ধাভরে অধিকলালের দিকে চাহিতে লাগিল।

ভগবতী দেবী বলিলেন, "সমুন্দরি তোর যে এতো উঁচু মন তাতো জানতাম না। খুদরু অত ভালো ছেলে, ওর পড়া বন্ধ করলে কি চলে? ওর পড়বার ব্যবস্থা আমরাই করব। ও আজ সাহেবগঞ্জে চলে' যাক—স্কুলে আর বোর্ডিংএ নাম লিখিয়ে আসুক—"

"আর আমার 'জেবর' "

তপনবাবু বলিলেন—"ওগুলো বিক্রি করে৷ যা টাকা হবে তা অধিকলালের নামে ব্যাংকে জমা করে' দেব। সেই টাকা থেকে ওর লেখাপড়া চলবে—"

ভগবতী অধিকলালকে বলিলেন—"চল, এখন খাবি চল। চপ-গুলো গরম করে' দিই। সমুন্দরি তুইও নিয়ে যা খানকয়েক তোর ছেলেমেয়েদের জন্য।"

সকলে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সমুন্দরি গেল না। সে তাহার জেবরের পেটারি আগলাইয়া বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পর্ব

১

অধিকলাল যেদিন সাহেবগঞ্জে আসিয়া বোর্ডিংয়ে ভরতি হইল সেদিন তাহার সহিত তাহার বাবা রংলালও আসিয়াছিল। অধিকলালকে ডাক্তারবাবু জামা জুতা কোট কাপড় সবই কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে রংলালের ছেলে। অধিকলালের বাক্স বিছানা সে-ই স্টেশন হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে সাধারণ কুলি বলিয়াই মনে হইতেছিল। সে-ই যে অধিকলালের বাবা বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। কিন্তু বোর্ডিংয়ে আসিয়া বৈরিয়া গ্রামের তেওয়ারিজির পুত্র ভূপেশ্বর তেওয়ারির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ভূপেশ্বর তেওয়ারির বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারি একজন বড় কন্ট্র্যাকটার। তিনি যখন মনিহারি অঞ্চলে একটি রেলোয়ে ব্রীজ প্রস্তুত করাইতেছিলেন তখন রংলাল তাঁহার অধীনে কুলির কাজ করিত। তাঁহার বাসনও মাজিয়া দিত। ভূপেশ্বর স্কুলে পড়িত তখন। অধিকলালের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। সে যখন পাস করিয়া চলিয়া আসে তখন অধিকলাল স্কুলে ভরতিও হয় নাই। ভূপেশ্বর ভালো ছেলে ছিল না। স্কুলে প্রতি ক্লাসেই অনেকবার ফেল করিয়া তবে সে প্রোমোশোন পাইয়াছে। এখন সে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে। গতবারেও সে টেস্ট পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই, এবারেও পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। তাহার বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারি ধনী লোক। তিনি চারজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিয়াছেন, ছেলেকে ম্যাট্রিকুলেশনটা তিনি পাশ করাইবেনই। তাহার পর তাহাকে ব্যবসায়ে

নিযুক্ত করিবেন। অনেক লোক রূপেশ্বরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ছেলেকে যখন শেষ পর্যন্ত ব্যবসাতেই ঢুকাইতে হইবে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করাইয়া লাভ কি হইবে। রূপেশ্বর বলিয়াছিলেন—লাভ কিছু হইবে না, লোকসানই হইবে। কিন্তু আমি কণ্ট্র্যাকটার মানুষ; যে কনট্র্যাকটে হাত দিই তাহাতে লাভ লোকসান যাহাই হউক সেটাকে শেষ না করিয়া ছাড়ি না। ভূপেশ্বর রংলালকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

"কি রংলাল না কি। তুমি আজকাল এইখানে কুলিগিরি করছ?"

"না, বাবুয়া। আমি আমার ছেলেকে ভরতি করাতে এসেছি এখানে। আমার ছেলে খুদরু জিলার মধ্যে পহেলা হ'য়ে জলপানি পেয়েছে?"

"কই তোমার ছেলে?—"

"এই যে। খুদরু তেওয়ারিজিকে গোড় লাগ—"

অধিকলাল ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে প্রণাম করিল কিন্তু তেওয়ারি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। রংলাল দোসাদের ছেলে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে! ওই দোসাদের ছেলেটা এখন হইতে তাহাদের সহিত এই বোর্ডিংয়ে থাকিবে না কি!

অধিকলালের জিনিসপত্র (একটা বাক্স এবং বিছানা) তাহার নির্দিষ্ট ঘরটিতে রাখিয়া রংলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে অধিকলালের কি সর্বনাশ যে করিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূপেশ্বর বোর্ডিংয়ে প্রচার করিয়া দিল যে অধিকলাল দোসাদের ছেলে। তাহার বাবা রংলাল তাহাদেরই বাড়িতে একদিন বাসন মাজিয়াছে।

অধিকলাল যে ঘরে 'সীট' পাইয়াছিল সেটি ফোর সীটেড রুম। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনটি বিছানায় তিন জন বসিয়া আছে—

যোগেন সা, বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক। তিন জনেই তাহার সমবয়সী। ইহারাও বাহির হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত একই ক্লাসে পড়িবে। অধিকলালও নিজের বিছানাটি চৌকির উপর পাতিয়া লইল।

"তুমি কি নতুন ভরতি হলে না কি—"

"হ্যাঁ—"

"কি নাম তোমার?"

"অধিকলাল পাসমান।"

যোগেন সা-ই প্রশ্ন করিতেছিল।

বিলট্ ঝা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"পাসমান? পাসমান তো দোসাদ। তুমি কোন জাত?"

"আমিও দোসাদ।"

জ্ঞান বসাক বলিল—"তুমি কোন স্কুল থেকে এসেছ?"

"মনিহারি স্কুল থেকে—"

"মনিহারি স্কুল তো এবার পূর্ণিয়া জেলায় ফার্স্ট হয়েছে। তুমি কি সেই ফার্ষ্ট বয় না কি?"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ঠিক এই সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহিম সেন প্রবেশ করিলেন। তিনি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। বোর্ডিংয়েই থাকেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"অধিকলাল, তুমি তোমার 'সীট' পেয়েছ তো? বাঃ। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় আমাকে গিয়ে বোলো, আমি নীচে কোণের ঘরটায় থাকি।"

তাহার পর অন্য ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"অধিকলাল পূর্ণিয়া জেলার ফার্স্ট বয়, আশা করি শুনেছ তোমরা। সবাই তোমরা মিলে মিশে ভালোভাবে পড়াশোনা কর। আমি জানি আজকালকার ছেলেরা সবাই ভালো। বাঃ—"

'বাঃ' বলাটা মহিম সেনের একটি মুদ্রাদোষ। সকলে আড়ালে তাঁহাকে 'বাঃ-মাস্টার' বলে। মহিম সেন চলিয়া যাইবার পর জ্ঞান বসাক বলিল—"একটা অঙ্ক পারছি না ভাই। থার্ড মাস্টার হোম টাস্‌ক্‌ দিয়েছেন, অঙ্ক করে না নিয়ে গেলে মারবেন—অথচ এই অঙ্কটা কিছুতেই হচ্ছে না—

"দেখি—"

অধিকলাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অঙ্কটা দেখিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"হ্যাঁ, হয়ে যাবে।"

পাটিগণিতের শক্ত অঙ্কটা অধিকলাল দশ মিনিটের মধ্যেই করিয়া দিল।

বিলট্‌ ঝা বলিল—"আমারও ছটো অঙ্ক করে দাও তাহলে। থার্ড মাস্টার বড় 'মারখুন্‌ডা'। অঙ্ক ঠিক না হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়।"

অধিকলাল তাহার অঙ্ক ছইটিও কষিয়া দিল। বিলট্‌ ঝা-ও অবাক হইল। কিন্তু সে যাহা বলিল, তাহাতে বিস্ময়ের বা কৃতজ্ঞতার সুর ফুটিল না। বলিল, "ভাই অধিকলাল, তুমি আমাদের ঘরে এসেছ এতে আমাদের পড়াশোনার খুব সুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের 'জাত'টা মেরো না ভাই। আমাদের খাবার টাবার যেন ছুঁয়ে দিও না, গাঁয়ের লোকে যদি শোনে আমরা দোসাদের ছোঁয়া খেয়েছি তাহলে আমাদের জাতে ঠেলে দেবে।"

অধিকলাল গম্ভীরভাবেই বলিল—"না, তোমাদের খাবার আমি ছোঁব কেন। আমি দূরেই সরে থাকব।"

যোগেন সা দেওয়ালে ঠেস দিয়া নিজের বিছানায় পা ছইটি ছড়াইয়া বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল—"আমার অত জাতবিচার নেই। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে। আমাদের চাকরবাকর সব মুসলমান। মা তাদের হাতের ছোঁয়া জল নেন না, কিন্তু ছুধ

নেন। আমি গফুরের বাড়িতে লুকিয়ে মুরগিও খেয়েছি। আমার কোন অসুবিধা হবে না ভাই—”

যোগেন হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া অধিকলালকে জড়াইয়া ধরিল।

সেই দিনই খাইবার সময় একটা কাণ্ড হইল। বোর্ডিংয়ে নীচে একটা ‘হল’ মতন ছিল। তাহাতেই বোর্ডিংয়ের ছেলেরা পাশাপাশি বসিয়া খাইত। খাওয়ার ঘণ্টা যখন হইল তখন যোগেন বলিল, “চল, অধিকলাল নীচে গিয়ে খেতে হবে—”। সকলে পাশাপাশি গিয়া বসিল। অধিকলালও গিয়া পঙক্তির একধারে বসিয়াছিল।

ভূপেশ্বর তেওয়ারি বসিয়াছিল আর এক প্রান্তে। ভূপেশ্বর তেওয়ারি আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—“তুম অলগ্ বৈঠো।”

(তুমি আলাদা বস)

“অলগ বসবে কেন ? ও কি মানুষ নয় ?”

প্রতিবাদ করিল যোগেন সা।

“ও দোসাদ—”

“না আমরা কেউ ওর সঙ্গে বসে’ খাব না।”

অধিকাংশ ছাত্রই দাঁড়াইয়া উঠিল।

রামচরণ ঠাকুর পরিবেশন করিবার জন্য ভাতের হাঁড়িটা লইয়া আসিয়া দেখিল সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

“কা ভইল্ ?”

(কি হ’ল)

তখন তেওয়ারি বলিল—“আজ একটা দোসাদের ছেলে এখানে ভরতি হয়েছে। তার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে খাব কি ক’রে ?”

রামচরণ গম্ভীর হইয়া সমর্থন করিল এ কথা।

“ঠিক বাত—”

অধিকলাল বলিল—"আমি উঠোনে বসে' খাব। ঠাকুরজী আমাকে ওইখানেই ভাত দাও।"

অধিকলাল নিজের থালা বাটি গেলাস লইয়া উঠানে নামিয়া গেল। উঠানের একধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল বোর্ডিংয়ের চাকর—রণছোড়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"তুমি বাবুয়া এখানে আংনাতে (উঠোনে) বসছ কেন?"

"আমার সঙ্গে ওরা একসঙ্গে বসে' খেতে চাইছে না—"

রণছোড় বাসন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা রণছোড়ের। একটা দৈত্য যেন। সে চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেল।

অধিকলাল উঠানে বসিয়াই আহার সমাধা করিল এবং স্কুলে চলিয়া গেল। অপমানে তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিতেছিল ইহা লইয়া ঝগড়া করিলে সেটা আরও লজ্জার কারণ হইবে।

স্কুলে গিয়া সে ক্লাসের একধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় ক্লাস লইতেছিলেন। শীর্ণকান্তি খর্ব লোক। নাকটি খুব টিকলো। চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। তিনি জ্যামিতি পড়াইবেন। ক্লাসের নবাগত ছেলেদের পরিচয় লইয়া তিনি ফেল-করা ছেলে নুটবিহারীকে বলিলেন—"নুটে তুই বোর্ডে গিয়ে একটা ত্রিভুজ আঁক তো।"

নুটবিহারী উঠিয়া গিয়া বোর্ডে একটা ত্রিভুজ আঁকিল।

"ত্রিভুজের ইংরিজি কি?"

"ট্র্যাংগ্‌ল্ সার।"

"ঠিক হয়েছে। তুই লেখাপড়ায় মন দিয়েছিস তাহলে। আচ্ছা এবার ওটার একটা নাম দে। না, A B C না, P Q R দে—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের পড়াইবার ধরন ওইরূপই ছিল। তিনি

ক্লাসের ভালো ছেলেদের প্রতি তেমন নজর দিতেন না, খারাপ ছেলেদের লইয়াই থাকিতেন। তাহাদের বিশেষ করিয়া পড়াইতেন।

"ট্র্যাংগেলের অ্যাংগেল তিনটেতে দাগ দে—ঠিক হয়েছে। এইবার অ্যাংগেল তিনটের নাম দে—"

এইভাবে পড়া চলিতেছিল, এমন সময় স্কুলের চাকর হরদেও আসিয়া বলিল, হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে আপিস ঘরে ডাকিতেছেন। অধিকলাল আপিস ঘরে গিয়া দেখিল বোর্ডিংয়ের চাকর রণছোড় দাঁড়াইয়া আছে।

হেডমাস্টার মহাশয় শান্ত ধীর গম্ভীর লোক। অধিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ খাওয়ার সময় কি কি হয়েছিল বল।"

"আমি জাতে দোসাদ। খাবার সময় সবাই এক সারিতে খেতে বসেছিলাম। কিন্তু তেওয়ারিজি আমাকে উঠে যেতে বললেন। আমি উঠে গেলাম। উঠোনেই আমি খেয়েছি—"

রণছোড়ের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। সে হিন্দী ভাষায় হেডমাস্টার মহাশয়কে যাহা বলিল তাহার মর্ম এই—"আপনি 'ইন্‌সাফ্' (সুবিচার) করুন। অধিকলাল শুনলাম খুব ভালো ছেলে। শুধু 'দোসাদ' বলেই ওকে এ অপমান সহ্য করতে হবে? 'দোসাদ' কি মানুষ নয়? ওকে যদি ওই 'হলে' বসে' খেতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমিও আর ওই বোর্ডিংয়ের বাসন মাজব না। আমিও জাতে 'দোসাদ'। দোসাদের এ অপমান আমি সহ্য করব না। মিউনিসিপালিটির মেথররাও আমার দোস্ত। আমার অপমানে তারাও 'বদ্‌লা' (প্রতিশোধ) নেবে। বোর্ডিংয়ের পায়খানা তারা 'কামাবে' না (পরিষ্কার করবে না)"

হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে বলিলেন, "যাও তুমি ক্লাসে যাও—"

অধিকলাল চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মহিমবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, অধিকলাল একটা মহা মুশকিল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই আজ ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে ডেকে বলে' দিয়েছেন সে যেন এ স্কুল ছেড়ে চলে' যায়, তাকে কালই তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। এটা হয়েছে তুমি ওদের সঙ্গে একসারে খেতে বসেছিলে বলে'।"

এই বলিয়া তিনি অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অধিকলাল সবই জানিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাহার কি যে কর্তব্য থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলিল, "আমি তো সার উঠে গিয়ে উঠোনে বসেছিলাম। রণছোড় গিয়ে যে হেডমাস্টার মশাইকে বলবে তা তো আমি জানতাম না। জানলে বারণ করতাম। কিন্তু এখন আমি কি করব বলুন—"

"ভূপেশ্বর তেওয়ারি এ বছর ম্যাট্রিক দেবে। ওকে যদি স্কুল থেকে চলে' যেতে হয় তাহলে ওর ক্ষতি হবে খুব—সে কথাটা ভেবে আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যদি এক কাজ কর, তাহলে—"

"কি বলুন—"

"তুমি হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে চলে যাও। গিয়ে বল তেওয়ারিকে চলে' যেতে বলবেন না। আমি আলাদা বসেই খাব।"

"বেশ আমি এখনই যাচ্ছি—"

স্কুল কম্পাউণ্ডেই মাস্টার মহাশয়ের কোয়ার্টার ছিল। অধিকলাল সেইখানেই গেল। অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার পর হরদেওকে সে দেখিতে পাইল। তাহাকেই বলিল—মাস্টার সাহেবের সহিত সে একটু দেখা করিতে চায়। হেডমাস্টার মহাশয় ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন।

"কে ?"

"আমি অধিকলাল—"

"কি চাও। ও—। তোমাকে আর বোর্ডিংএ কেউ অপমান করবে না আমি ব্যবস্থা করে' দিয়েছি।"

"আমি আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে। তেওয়ারিজিকে আপনি বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেবেন না, সার। ওঁর এ বছর পরীক্ষা দেবার কথা। আমি আলাদা বসে'ই খাব, ওতে আমার কোন অপমান হবে না। রণছোড়কে আমি আপনার কাছে আসতে বলি নি, ও নিজেই এসেছিল। ওকে আমি এখনি বলব গিয়ে ও যেন কোন গোলমাল না করে—"

হেডমাস্টার মহাশয় এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

"এতে তোমার অপমান হয় নি বলছ ?"

"আমার সঙ্গে বসে কেউ যদি না খেতে চায় তাহলে তাকে দোষ দেব কি করে'। এই তো আমাদের দেশের নিয়ম। আমিও যে দোসাদ হয়ে জন্মেছি তাতেও আমার কোন দোষ নেই। তাই আমি অপমানিত হই নি। তেওয়ারিজি আমাকে অপমান করেন নি, তিনি দেশের যা নিয়ম তাই মেনে চলবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ নিয়ে তাঁর মনে কষ্টের কারণ হ'য়ে থাকতে চাই না। আপনি—"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

অধিকলাল চলিয়া গেল। হেডমাস্টার মহাশয় তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। সে যে লেখা-পড়ায় ভালো এ খবর তিনি তাহার পরীক্ষার ফল দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। এখন অনুভব করিলেন তাহার চরিত্রও অসাধারণ।

মহিম সেন, পণ্ডিতজি (জানকীনাথ ওঝা) এবং গণিতের শিক্ষক থার্ড মাস্টার (হাবুল বোস) তেওয়ারির চলিয়া যাইবার সম্ভাবনায়

মর্মাহত হইয়াছিলেন। কারণ তেওয়ারি তাঁহাদের নিকট প্রাইভেটে পড়িত এবং প্রত্যেককে কুড়ি টাকা করিয়া বেতন দিত। তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া অধিকলালকে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মহিম সেন তাঁহাদেরই মুখপাত্র হইয়া অধিকলালকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া মহিমবাবুকে গিয়া বলিল—"হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে আমি সব বলেছি। বলেছি যে আমি আলাদা বসেই খাব, আপনি তেওয়ারিজিকে চলে' যেতে বলবেন না—"

"বাঃ—। কিছু বললেন তোমাকে?"

"না—"

একটু পরেই কিন্তু হেডমাস্টার মহাশয় বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির হইলেন। মহিমবাবুর ঘরে গিয়া বলিলেন—"ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে ডাকুন—"

ভূপেশ্বর তেওয়ারি আসিলে বলিলেন—"এখনি অধিকলাল আমার কাছে গিয়েছিল। সে বলছে তোমাকে যেন স্কুল থেকে তাড়ানো না হয়, সে আলাদা বসেই খাবে। তুমি স্কুলের ওঁছা ছেলে, প্রত্যেক ক্লাসে দু'তিনবার করে' ফেল করেছ, আর অধিকলাল একটি রত্ন। পূর্ণিয়ার বোর্ড পরীক্ষায় সে সব বিষয়ে প্রথম হ'য়ে এই স্কুলে এসে ভরতি হয়েছে। সে দোসাদের ঘরে জন্মেছে বলে' তাকে ছোট করবার অধিকার কারো নেই। তাই আমি ঠিক করেছি যে সে বোর্ডিংয়ে খাওয়ার 'হলে' বসেই খাবে। তবে সকলে যদি আপত্তি করে সামান্য একটু দূরে বসে' খাবে। সে উঠোনে খাবে এ কখনই হতে পারে না। তোমার এতে আপত্তি আছে?"

তেওয়ারি বলিল—"না সার। আমি তো—"

"আচ্ছা যাও—"

অধিকলাল 'হলে'ই একটু তফাতে বসিয়া খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার মর্যাদা আরও যেন বাড়িয়া গেল!

২

অধিকলাল স্কুল লাইব্রেরিতে বই লইবার জন্য গিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টারই স্কুল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। তিনি প্রতি শনিবারে এক ঘণ্টা করিয়া লাইব্রেরিতে বসেন। অধিকলাল গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তুমি এর আগে বই নিয়েছ কি?"

"না—"

"তাহলে ওই প্রথম আলমারিটা থেকে শুরু কর। প্রথম তাকে প্রথম যে বইটা আছে, সেইটে নিয়ে এস।"

অধিকলাল ডিকেন্সের লেখা 'অলিভার টুইস্ট' বাহির করিয়া আনিল এবং সেইটাই বাড়ি লইয়া গেল। পড়িতে গিয়া কিন্তু দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা যাইতেছে না। অভিধান দেখিয়া সাতদিনে পাতা চারেক পড়িল সে। পরের শনিবার বইটি লইয়া সে আবার ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কাছে গেল।

"বড় শক্ত বই সার। ভাল বুঝতে পারছি না। ডিক্‌শ্‌নারি দেখে পড়তে হচ্ছে, সাতদিনে মাত্র চার পাতা পড়তে পেরেছি। আমাকে একটা সহজ বই দিন।"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "ওই বইটাই আবার নিয়ে যাও। ডিক্‌শ্‌নারি দেখে পড়তে হবে না, এমনি পড়ে ফেল।"

"কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না যে সার।"

"তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আগাগোড়া পড়ে' ফেল সবটা। যখন কোন অচেনা শহরে যাও, তার সব কি বুঝতে পার? রাস্তায়

রাস্তায় পার্কে ময়দানে হেঁটে বেড়ালেই যথেষ্ট মনে হয়। সবটা বোঝবার দরকার কি। তুমি পরে যদি ইংরেজি সাহিত্য পড় ও বই তোমাকে আবার পড়তে হবে, তখন ভাল করে' পোড়ো। এখন এমনই পড়ে' যাও—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের এই অদ্ভুত উপদেশ অনুসারে অধিকলাল দুই তিন মাসের মধ্যেই আলমারির সমস্ত ইংরেজি বইগুলি পড়িয়া ফেলিল—ডিকেন্স্ স্কট, জর্জ ইলিয়ট্, ফিলডিং বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যের যতগুলি নামজাদা ক্ল্যাসিকাল বই স্কুলে ছিল সবগুলিরই পাতা উলটাইয়া গেল সে। অধিকাংশ বইয়েরই প্রকৃত অর্থ সে বুঝিল না বটে, কিন্তু দুই একটা কথা যাহা সে বুঝিল তাহারই সাহায্যে তাহার কল্পনা এক একটা নূতন নূতন গল্প সৃষ্টি করিল তাহার মনে। অনেক বইয়ে ছবিও থাকিত, ছবি থাকিলে অধিকলালের কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িত যেন। ইংরেজি বইয়ের আলমারি যখন শেষ হইয়া গেল তখন বাংলা বইয়ের আলমারি আরম্ভ হইল। তখন স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেনের সতী, বেহুলা, জড়ভরত, রামায়ণী কথা প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকলাল সেগুলি এক একদিনেই শেষ করিতে লাগিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় একদিন তাহাকে বলিলেন—"এক আলমারি ইংরেজি বই তো পড়ে ফেললে, এ বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ কর না। পারবে না?"

"পারব না কেন। করে' ফেলতে পারি, কিন্তু আমার তো অনেক ভুল হবে সার। সেগুলো ঠিক করে দেবে কে—"

ফোর্থ মাস্টার যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"আমি রোজ রাত্রে আটটার সময় খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটতে বেরুই। তুমি যদি অনুবাদ করে' রাখ আমি রাত নটার সময় রোজ তোমার বোর্ডিংয়ে যাব। 'কমন রুমে বসে' সেগুলো দেখে দেব।"

"আচ্ছা সার, আমি করব—"

সেইদিন হইতে অধিকলাল প্রত্যহ অনুবাদ করিয়া রাখিত। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ও প্রতিদিন আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। অধিকলাল ম্যাট্রিকুলেশন না পাস করা পর্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় অবিবাহিত লোক ছিলেন। দেশ হইতে একটি বুড়ো চাকর আনিয়াছিলেন, সেই তাঁহার সব করিত। ছোট একটি বাসা ভাড়া করিয়া আলাদা থাকিতেন তিনি। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক এবং সংস্কৃত খুব ভাল জানিতেন। প্রাইভেট ট্যুশনি করিতেন না। তেওয়ারি অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে পড়াইতে রাজি হন নাই।

৩

অধিকলালের স্কুলজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যে ঘটনাগুলিতে অধিকলাল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাই বলিব। এই ইস্কুলেও হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় অধিকলাল সব বিষয়ে প্রথম হইল। সাফল্যের এই দীপ্তিতে সে যে নীচজাতীয় দোসাদ এ কথাটা যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। হাবুল বোসের মতো দুর্ধর্ষ মাস্টারও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। হাবুল বোসের পড়াইবার কায়দা ছিল প্রত্যেক ছেলেকে প্রচুর 'হোম টাস্‌ক্‌' দিতেন, প্রত্যেককেই বাড়িতে কুড়ি পঁচিশটি অঙ্ক কষিতে হইত। যাহারা পারিত না, তাহারা হাবুল বোসের নিকট মার খাইত। হাবুল বোস ক্লাসেও খুব তাড়াতাড়ি পড়াইতেন। তখন ইংরেজিতেই পড়ানো হইত। হাবুল বোস জ্যামিতি অনেকটা সিনেমার কায়দায় পড়াইতেন। বোর্ডের কাছে গিয়া বলিতেন—আজ ফাস্ট' বুক থেকে

শুরু করছি। আমি বোর্ডে এঁকে যাচ্ছি তোমরা বলে' যাও আমার সঙ্গে। বোর্ডে একটি সরল রেখা আঁকিলেন এবং তাহার নাম দিলেন A B। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের বলিতে হইবে—Let A B be a straight line ঃ তাহার উপর আর একটি সরল রেখা দাঁড় করাইয়া দেন হাবুল বোস, তাহার নাম দেন C D ঃ সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের ছেলেদের বলিতে হইবে—Let the straight line C D stand upon it ঃ তাহার পর দুইটি সন্নিহিত কোণে দাগ দিবামাত্র ছেলেদের বলিতে হইবে—It is required to prove that the two adjacent angles are together equal to two right angles ঃ এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রথম থিয়োরেম পড়ানো হইয়া যাইত। তাহার পর আরম্ভ করিতেন দ্বিতীয় থিয়োরোম। এইভাবে একঘণ্টার মধ্যে তিনি ফার্স্ট-বুকটা শেষ করিয়া ফেলিতেন। কোন ছেলের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না, সমস্ত ছেলেকে 'নামতা ঘোষা'র মতো করিয়া বলিয়া যাইতে হইত। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হাবুল বোস সঙ্গে সঙ্গে তাহার চুল টানিয়া দিতেন, বার বার আবৃত্তি করিয়া ছেলেরা জ্যামিতিটাকে মুখস্ত করিয়া ফেলিত। হাবুল বোস এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে গুড্ ওল্ড্ মেথড (Good old method) বলিতেন। ফোর্থ মাস্টারও সপ্তাহে দুইদিন 'রিভিশন ক্লাস' (revision class) লইতেন। তিনিও জ্যামিতি পড়াইতেন, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। তাঁহার লক্ষ্য থাকিত নুটে, ক্যাবলা, লখাই, প্রভৃতি খারাপ ছেলেদের উপর। হাবুল বোস ছেলেদের বাড়ি হইতে 'extra' করিয়া আনিতে বলিতেন। অনেকেই পারিত না। হাবুল বোস দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতেন। তাহার পর অবশ্য কোনও ভালো ছেলেকে বলিতেন—তুমি বোর্ডে গিয়ে এটা বুঝিয়ে দাও। অধিকলালকে প্রায়ই বোর্ডে গিয়া 'এক্স্ট্রা' বুঝাইতে হইত। ক্লাসের সব ছেলেই হাবুল বোসের নিকট একবার না একবার

(অনেকেই একাধিক বার) মার খাইয়াছে, কিন্তু অধিকলাল একদিনও মার খায় নাই। হাবুল বোস তাহাকে যে শুধু ভাল বাসেন তাহা নয়, শ্রদ্ধাও করেন মনে মনে। সব মাস্টারই ভালবাসেন তাহাকে। এমন কি পণ্ডিতজিরও দোসাদ-বিরোধী শক্ত মনোভাব অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে এতো ভাল ছাত্র তিনি একটিও পান নাই। তাছাড়া সে বিনয়ী, স্বল্পবাক, সত্যবাদী। একটিও মিথ্যাকথা কখনও বলে না। একদিন কিন্তু বলিয়াছিল, সেই ঘটনাটিই বলিব।

অধিকলাল বোর্ডিংএ যে ঘরটিতে ছিল সে ঘরের অন্য তিনজনও যোগেন সা, বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক অধিকলালের সহপাঠি। দোসাদ বলিয়া অধিকলালের বিরুদ্ধে তাহাদের মনের যে ক্ষোভ ছিল তাহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অধিকলাল না থাকিলে হাবুল বোসের মারের চোটে তাহাদের পিঠের চামড়া হয়তো উঠিয়া যাইত। অধিকলালই সব অঙ্ক কষিত। তাহারা টুকিয়া লইত। সুতরাং অধিকলালের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞও ছিল তাহারা। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাফল ওয়ালের (baffle wall) আড়ালে সৈনিকরা যেমন আত্মরক্ষা করে অধিকলালের আড়ালে ইহারাও তেমনি নিজেদের কান এবং পিঠ বাঁচাইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটা মুশকিল হইল। ঘরে চুরি আরম্ভ হইয়া গেল। পয়সা চুরি। বিলট্ ঝার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নয়। সে একদিন বলিল তাহার জামার পকেটে খুচরা টাকা ছিল। বেশী নয়, মাত্র তিনটি। কিন্তু তাহা চুরি হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান বসাক বালিশের তলায় পয়সা রাখিত। সে একদিন বলিল আট আনা পয়সা কে সরাইয়াছে। যোগেন সা বলিল তাহারও বাক্স হইতে টাকা চুরি গিয়াছে। বিলট্ ঝা আড়ালে একদিন সকলকে বলিল—এ অধিকলালেরই কাজ। পড়াশোনায় হাজার ভালো হোক, ছোটলোকের ছেলে তো! কিন্তু একথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলা গেল না। তাহার পর আর এক

কাণ্ড হইল। অধিকলাল একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিল তাহার তালাটিও ভাঙিয়া কে তাহার সযত্ন-সঞ্চিত দশ টাকার নোটটি লইয়া গিয়াছে। এই নোটটি তাহাকে ভগবতী দেবী আসিবার সময় দিয়াছিলেন। অধিকলাল ঠিক করিয়াছিল নিতান্ত বিপদে না পড়িলে সে এটি খরচ করিবে না। বাক্সের তালা খুব মজবুত ছিল না। সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিল সে। বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক বলিল যে সম্প্রতি তাহাদেরও টাকা-পয়সা চুরি গিয়াছে। তাহার পরদিন একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিল। যোগেন সা একটা এয়ার গান কিনিয়া আনিল। বলিল তাহার বাবা তাহাকে নাকি জন্মদিনে টাকা পাঠাইয়াছেন। সকলে অবাক হইয়া গেল। জ্ঞান বসাকের একটু হিংসাও হইল। সে গরীবের ছেলে। তাহারও একদা 'এয়ার গান' কিনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বাবা কিনিয়া দেন নাই, দিতে পারেন নাই। বিলট্ ঝা কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। দিন দশ পরে আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেদিন রবিবার। হঠাৎ দাড়িওলা গ্যাট্টাগোঁট্টা একটি লোক আসিয়া হাজির। পরনে খাকীর প্যান্ট ও শার্ট। হাতে একগাছা লক্‌লকে বেত।

"যোগেন কোন ঘরে থাকে—"

যোগেন বাহির হইয়া আসিল।

"তুমি এয়ার গান কিনেছ?"

যোগেন মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুমি এদের বলেছ যে আমি তোমার জন্মদিনে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছি?"

যোগেন মিথ্যা কথা বলিবার চেষ্টা করিল—"না, আমি—"

তিনি পকেট হইতে চিঠি বাহির করিলেন—"এই যে তোমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহিমবাবু আমাকে লিখেছেন—"

বিলট্ ঝা বাহির হইয়া বলিল—"আমাদের টাকা পয়সা প্রায় চুরি যাচ্ছে।"

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যোগেনের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে চাবকাইতে লাগিলেন।

"আমি দারোগা। অনেক চোরকে শায়েস্তা করেছি। আমার ঘরেই চোর জন্মেছে! আজ খুন করে' ফেলব তোকে—"

শপাশপ্ বেত পড়িতে লাগিল। যোগেনের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরা নিজেদের ঘর হইতে বাহির হইয়া একটু দূরে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মজা দেখিতে লাগিল। মারের চোটে যোগেন পড়িয়া গেল, তবু তাহার বাবা তাহাকে মারিতে লাগিলেন।

অধিকলাল হঠাৎ আগাইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

"আর মারবেন না ওকে—"

"আগে আমি জানতে চাই এ বন্দুক কেনার টাকা কোথা থেকে পেল—"

"আমি দিয়েছি।"

"তুমি? তুমি কে—"

"আমি ওর সঙ্গে পড়ি। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমরা এক ঘরে থাকি—"

মহিমবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি যোগেনের বাবাকে নীচে লইয়া গেলেন। অধিকলাল যোগেনকে মাটি হইতে তুলিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। যোগেন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। বিলট্ ঝা প্রশ্ন করিল—"তুমি ওকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে? তবে তুমি যে বললে তোমার বাক্স ভেঙে কে দশ টাকা চুরি করেছে?"

সে কিছু বলিল না। স্বল্পবাক অধিকলাল বেশী কথা বলিত না।

বিলট্ ঝা আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিল। কিন্তু অধিকলাল কোন উত্তর দিল না।

একটু পরে মহিমবাবু তাহাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অধিকলাল গিয়া দেখিল যোগেনের বাবাও বসিয়া আছেন।

"তুমিই যোগেনকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে?"

"হাঁ, সার—"

"তুমি টাকা কোথা পেলে? তোমার টাকা তো তপনবাবু ডাক্তার প্রতিমাসে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন—"

"আমি যখন এখানে আসি তখন মা আমাকে দশ টাকা দিয়েছিলেন"

"তোমার মা? তোমার মা তো শুনেছি—"

"আমার মা নয়, তপনবাবুর স্ত্রী। তাঁকেও আমি মা বলি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় চিঠি লিখে জানতে পারেন।"

"তুমি ও টাকা যোগেনকে দিতে গেলে কেন?"

"দেখলাম ওর ওই বন্দুকটা কেনার খুব ইচ্ছে। তাই দিলাম।"

মহিমবাবু ও যোগেনের বাবা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। যোগেনের বাবা পরের ট্রেনেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ছেলে যে চোর নয় ইহার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছিল। অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যোগেন তেমনিভাবেই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতেছে। পরদিন যোগেন স্কুলে গেল না। স্কুল হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল যোগেন নাই। টেবিলের উপর এয়ারগানটি রহিয়াছে। আর একটি চিঠি।

ভাই অধিকলাল, আমি আর এ ইস্কুলে পড়িব না। বাড়ি যাইতেছি। বন্দুকটি তোমাকে দিয়ে গেলাম। ইতি যোগেন

৪

অধিকলাল যেবার সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিল সে বছর তাহাকে একটি বড় সোনার মেডেল দেওয়া হইল। স্বর্গীয় জমিদার নিবারণ সিংহ বহুকাল পূর্বে এই মেডেলের টাকা দিয়াছিলেন। শর্ত ছিল—সব বিষয়ে যে ছেলে প্রথম হইবে তাকেই এই মেডেল দেওয়া হইবে। গত পনের বছর কোন ছেলে সব বিষয়ে প্রথম হয় নাই। অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় সোনার মেডেলই হইয়া গেল। মেডেলটি পাইবার পরই অধিকলাল বাড়ি চলিয়া গেল। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের কাছেই মেডেলটি রাখিল সে। সমুন্দরি একটা ঝঙ্কার দিয়া পা সরাইয়া লইল।

"ই সব সোনা দানা লেকে হাম কি করব? মাইজিকে পাস দে যা কে—"

(এ সব সোনা দানা নিয়ে আমি কি করব। মাইজিকে দে এসব—)

সমুন্দরি মুখে একথা বলিল বটে কিন্তু তাহার চোখে মুখে গর্বের একটা দীপ্তি ঝলমল করিতে লাগিল। মেডেলটা তুলিয়া উলটাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল সে।

"চল মাইজিকে পাস্"

(চল মাইজির কাছে)

তপনবাবু রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা হইল না। তনু দূর হইতে অধিকলালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর খবর দিল—"মা খুদেরুদা এসেছে—।"

আগে তনু আসিয়া তাহার উপর যেমন ঝাঁপাইয়া পড়িত এখন আর তাহা করে না। এখন সে বড় হইয়াছে, এখন আগেকার মতো চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জা করে। সে বাহিরের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং আনন্দে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

"নখু কোথা ?"

"সে লাইব্রেরির ঘরে আছে। সেই তো এখন লাইব্রেরিয়ান। ডেকে আনব ? পড়ার সময় বিরক্ত করলে সে রেগে যায়। জান ? ভারি রাগী হয়েছে আজকাল।"

"এবারই তার পরীক্ষা, না ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, থাক ডাকতে হবে না। আমিই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।"

সমুন্দরি বাড়ির ভিতর চলিয়া গিয়াছিল এবং ভগবতীকে মেডেলটি দিয়া বলিতেছিল—"ই তু, রাখ্‌থি দে। হামরা হুঁয়া চোরি হো যাইবে। যোগিয়া এক নম্বর চোর ছে—"

(তোর কাছেই রেখে দে। আমার ওখানে চুরি হ'য়ে যাবে। যোগিয়া একের নম্বর চোর)

"যোগিয়া আবার কে ?"

"রামগোবিনোয়া কা বেটা—"

(রামগোবিনের ছেলে)

অখিকলাল গিয়া ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কি সুন্দর মেডেল পেয়েছিস তুই খুদরু। চমৎকার মেডেলটি। তোর মা বলছে তোর বৌয়ের গলায় পরিয়ে দেবে।"

তনু বলিয়া উঠিল—"তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে জান

খুদরুদা। ভগতলালের মেয়ের সঙ্গে। অনেক দেবে-থোবে। তোমাকে সাইকেল দেবে, ঘড়ি দেবে—"

অধিকলাল ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহাদের সমাজে এই বয়সেই তো বিবাহ হয়। সে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক বই পড়িয়াছে। অনেক বাঙালী সাহিত্যিকই বাল্য-বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। তবু কিন্তু এ খবর শুনিয়া তাহার মন বিরূপ হইল না। ভালই লাগিল বরং। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি
বাঁধা কূপ, তরুতল বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি

একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল মনে। ভগতলাল কোথায় থাকে, কি করে, কোন গ্রামে তাহার বাড়ি সে কিছুই জানে না, তবু মনে হইল রবীন্দ্রনাথ যাহা কল্পনা করিয়াছেন সেই পরিবেশেই বোধহয় তাহার বালিকা-বধূও মানুষ হইতেছে।

ভগবতী দেবী অধিকলালকে খাবার আনিয়া দিলেন। সমুন্দরিকে বলিলেন—"আজ মালপো করেছি। তোর আজবলাল আর সুলিয়া তিলিয়ার জন্যেও নিয়ে যাস। আজবলাল তো কখনও আসে না, সে পড়াশোনা করছে তো?

সমুন্দরি বলিল—"উ বদমাশ ছে মাইজি, খালি গুড্ডি আর কবাড্ডি—"

(ও দুষ্টু ছেলে মাইজি, খালি ঘুড়ি আর হাডুডুডু খেলা নিয়ে থাকে)

তনু বলিল—"ও সব ক্লাসেই ফেল করছে। মাইনার পাস করতে করতেই ওর গোঁফ উঠে যাবে।" বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তুই চুপ কর। নখুকে ডেকে আন—"

অধিকলাল বলিল, "নখু পড়ছে ওকে এখন বিরক্ত করার দরকার নেই। আমি যাবার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে' যাব। নখুর রেজাল্ট কেমন হচ্ছে ?"

"দাদাও ফাস্ট হয় ক্লাসে। তুমিই ওর আদর্শ—"

তন্থু আবার ফোড়ন কাটিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"ক'দিনের ছুটি ?"—ভগবতী দেবী প্রশ্ন করিলেন।

"আমি কালই চলে' যাব। মাকে মেডেলটা দিতে এসেছিলাম।"

"খুব খুশী হয়েছি আমরা। এমনি করে' দেশের দশের মুখোজ্জ্বল কর।"

অধিকলাল হঠাৎ প্রশ্ন করিল।

"আমার টাকা কি আপনারা পাঠান ?"

"তোমার মায়ের সব গয়না বিক্রি করে' যে টাকা হয়েছে সে টাকা উনি ব্যাংকে fixed deposit করে দিয়েছেন। তার থেকে যে স্থদ আসে তা তোমাকে পাঠিয়ে দেন, উনিও কিছু দেন।"

সমুন্দরি গজগজ করিয়া উঠিল। ছেকাছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ ডাক্তারবাবুর কথায় সব গহনাগুলো বিক্রয় করিয়া ভুল করিয়াছে সে। এখন পুতহুকে (পুত্রবধুকে) সে কি দিবে। মেয়েদেরও বিবাহ দিতে হইবে।

ভগবতী আশ্বস্ত করিলেন তাহাকে।

"সে হবে এখন, তার জন্যে ভাবছিস কেন। অধিকলাল যদি দাঁড়িয়ে যায় ওই সব করবে।"

অধিকলাল আর সেখানে দাঁড়াইল না।

"চল, নখুর সঙ্গে দেখা করে' আসি"

তন্থু বাহিরে গিয়া চুপিচুপি বলিল—"খুদরুদা, তোমার বউকে আমি দেখেছি। এখানে একদিন বাবার কাছে দেখাতে এনেছিল,

চোখের জন্যে। চোখটা একটু ট্যারা। বাবা বললে ও যেমন আছে থাক, লক্ষ্মী ট্যারা সুলক্ষণ। রং ফর্সা—"

"তোর পছন্দ হয়েছে ?"

"খুব যে একটা আহা-মরি তা নয়, তবে ভালই। অনেক দেবে-থোবে। বাবার সঙ্গেই কথা হয়েছে সব।"

"তোমার বাবার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। রংলাল বললে ডাক্তারবাবু যা বলবেন তাই হবে। তাই বাবাকে কথা বলতে হ'ল।"

তনু পাকা গিন্নীর মতো ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া তাহার বিবাহের নানা রকম খবর তাহাকে দিতে লাগিল। ভগতলাল নাকি খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। চৌরিয়া গ্রামে বাড়ি। জমিজমা আছে। মহিষের বাথানও আছে।

"বাবা রংলালকে বললেন এখানে বিয়ে হ'লে শ্বশুর পরে তোমার পড়ার খরচও চালাতে পারবে"

"শ্বশুরের কাছ থেকে আমি পড়ার খরচ নেব না।"

"নেবে না ?"

"না—"

"নেবে না কেন, শ্বশুর তো আপন লোক।"

"তুই থাম।"

লাইব্রেরি ঘরের সামনে আসিয়া অধিকলাল ডাক দিল "নখু—"

সঙ্গে সঙ্গে নখু বাহির হইয়া আসিল।

"কে খুদরুদা, এস এস।"

"পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?"

"হচ্ছে একরকম। তোমার খবর কি"

তনু বলিল—"খুদরুদা সোনার মেডেল পেয়েছে। মাকে দিতে এসেছে—"

তাই নাকি !"

"হ্যাঁ। কি সুন্দর দেখতে মেডেলটা, আর কত ভারি। এক ভরি হবে বোধ হয়, না খুদরুদা ?"

"জানি না—"

"মা বলেছে ওটা ওর বউকে দেবে। একটা সরু সোনার হারে লকেটের মতো করে' দিলে সুন্দর মানাবে !"

নখু ধমকাইয়া উঠিল—"তুই চুপ কর। এতো ফাজিল হয়েছিস তুই—"

অধিকলালের দিকে তাকাইয়া তন্থ মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বলি নি তোমাকে, দাদা আজকাল ভয়ানক তিরিক্ষি হয়েছে। কথায় কথায় রেগে ওঠে।"

লাইব্রেরির আলমারির একটা খুরায় সরু লোহার শিকল বাঁধা ছিল একটা। সেটা দেখাইয়া অধিকলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি, কুকুর পুষেছিলে নাকি ?"

"ও সে কথা তো তোমাকে বলাই হয় নি। কুকুর নয়, নেউল বাচ্চা পুষেছিলাম একটা। লেধু গোয়ালা মাঠ থেকে এনে দিয়েছিল।"

তন্থ ঘটনাটা সোৎসাহে বর্ণনা করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

"কই সেটা—"

"ওরে বাবা। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি। তাও যেতে চায় না। প্রথম দিন এসেই তো আমাদের পাত থেকে মাছ তুলে নিয়ে গেল। মারলেও শোনে না। হকরু শেষকালে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে। ও কি দড়িতে বাঁধা থাকবার পাত্র! কুটুস করে' কেটে দিলে দড়ি। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে কাঁচা মাছই নিয়ে এল একটা। মার মার ধর ধর—শোনে কি। শেষকালে বাবা বললে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। আমাদের টম কুকুরের একটা শিকল ছিল, সেইটে খুঁজে হকরু যেই বাঁধতে গেছে—অমনি তার হাত কামড়ে দিলে।

রক্তারক্তি কাণ্ড। তবু হকরু ছাড়ে নি, গলায় শিকল বেঁধে এইখানে নিয়ে এল। তারপর আমি যেই দুধ দিতে গেছি—সে কি রাগ—গরগর গরগর করে আমাকে তেড়ে এল। আমি তো দে ছুট। আর একটু হলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মা বললে ওকে রাখতে হবে না। বিদেয় করে' দে। লেধু বললে দু'চার দিন পরেই পোষ মেনে যাবে, বিল্লির মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হল না। ছেড়ে দেওয়া হল। তবু যেতে চায় না। শেষে দেখ মার করতে পালাল। এখনও মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয় এসে!"

"ও, আচ্ছা—"

ইহার বেশী অধিকলাল কিছু বলিল না। তবু একটু দুঃখিত হইল ইহাতে। তাহার মনে হইল খুদরুদাও কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

অধিকলাল বলিল—"লাইব্রেরিটা ঠিক করে রেখেছ তো?"

"হ্যাঁ—"

"নতুন বই কি কি কেনা হয়েছে?"

"পুরোনো মাসিক পত্রগুলো বাঁধিয়েছি। শরৎচন্দ্রের কিছু বই কেনা হয়েছে।"

"চল দেখি।"

অধিকলাল সেদিন যখন ফিরিয়া আসিল তখন একটি কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মনের আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাহার ভাবী বধূ যে ঈষৎ ট্যারা এ সংবাদে সে বর্ণচ্ছটার মহিমা এতটুকু কমিল না।

তবু তাহার বাল্যসঙ্গিনী। সে সুন্দরী, তাহাকে সে ভালও বাসে কিন্তু তাহাকে সে তাহার প্রণয়িনী বা পত্নীরূপে একবারও কল্পনাও করিল না। এ সম্ভাবনা তাহার মাথাতেই আসিল না।

তখনও সে অনাধুনিক ছিল। 'সব মানুষই সমান' এই মন্ত্রের মদিরা পান করিয়া তখনও সে সহস্রবাহু স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী হয় নাই। পশুদের সহজাত সংস্কারের মতো সেকেলে নীতি তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কোনদিনই সে একেলে আধুনিক হইতে পারে নাই, এইটাই বোধহয় তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি।

৫

অধিকলাল যেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠিল সেবার একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। রংলাল এবং সমুন্দরি বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির। সমুন্দরির মাথায় প্রকাণ্ড একটা কাপড় ঢাকা রঙীন ডালাতে প্রচুর 'ঠেকুয়া' এবং 'খাবুনি'। কয়েকদিন আগে 'ছট্ পরব' হইয়া গিয়াছিল। তাহারই 'পরসাদ' আনিয়াছে। অধিকলালের জন্যই সমুন্দরি নাকি মানত করিয়াছিল। এবারও অধিকলাল ফার্স্ট হইয়া প্রমোশন পাইয়াছে।

অধিকলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এত 'প্রসাদ' লইয়া সে কি করিবে। দোসাদের বাড়ির 'প্রসাদ' তো কেহ খাইবে না।

মাকে বলিল—"এত প্রসাদ খাবে কে? তুই কি ভুলে গেছিস আমরা 'দোসাদ', আমাদের ছোঁয়া কেউ খাবে না! এখানে সব 'উঁচা' জাতের ছেলেরা থাকে।"

রংলালও একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমার মাকে তো চেন, যা জিদ ধরবে ছাড়বে না।"

সমুন্দরির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইল। সে ছেকাছেনি ভাষার যাহা বলিল তাহার সরল বাংলা—দেবতার প্রসাদ লইয়া

যাহারা জাত-বিচার করে তাহারা মানুষ নয়। দেবতার কাছে আবার 'উঁচা' জাত 'নীচা' জাত কি। সব জাতই সমান।

জ্ঞান বসাক আগাইয়া আসিয়া কহিল—"ঠিক বলেছিস মাই। আমার কোন জাত-বিচার নেই আমাকে প্রসাদ দে—"

সে হাত পাতিয়া প্রসাদ লইল এবং খাইয়া ফেলিল। বিলট্ ঝা ঘরের ভিতর বসিয়া পড়ার ভান করিতেছিল।

জ্ঞান বলিল—"বিলট্ তুমি খাবে নাকি, চমৎকার খাবুনি। খেয়ে ফেল, দেবতার প্রসাদে দোষ নেই—"

বিলট্ ঝা তবু 'গুম' হইয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান বলিল—"এক কাজ করি। পণ্ডিতজির ঘরে গঙ্গাজল আছে, সেই গঙ্গাজল এনে ছিটিয়েদি ওগুলোর উপর, তাহলে শুদ্ধ হ'য়ে যাবে"

সমুন্দরি বলিল, "না, বেটা। ভগবানের প্রসাদকে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে' নিতে হয় না, আমি তোমাদের জন্য এনেছি, যার খুশি হয় খাও, আমি কোন জবরদস্তি করছি না। এর বিচার ছট্ মাই করবেন, সুরুয দেব (সুর্যদেব) করবেন। ওঁদের 'দোয়াতে'ই (আশীর্বাদেই) আমার খুদরু প্রত্যেক ইন্‌তিহানে (পরীক্ষায়) ভালো করেছে। তাই আমি তোমাদের জন্যও এনেছি। তোমরা ভালো হও এই আমি চাই—"।

বিলট্ ঝা সেবার ইংরাজিতে ফেল করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একটু দ্বিধায় পড়িল। এমন সময় বোর্ডিংয়ের চাকর রণছোড় আসিয়া হাজির। বোডিংএ সেই অধিকলালের 'গার্জেন' ছিল। যখন তখন আসিয়া খবর লইত। সেই একমাত্র লোক যে তাহাকে বলিয়াছিল তোমার কোন ভয় নাই। কোন বিপদে পড়িলে আমি 'জি জান' (জীবন) দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। অধিকলাল স্কুলের নাম-করা ভালো ছেলে এবং সে জাতে 'দোসাদ',

'তাহারই জাত', এই অহঙ্কারে সে মশগুল হইয়া থাকিত। অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে সে জানিত না। সে-ও অধিকলালের জন্য দুইটি 'ঠেকুয়া' শালপাতায় মুড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল। অধিকলালের বাবা-মার পরিচয় পাইয়া এবং এক ডালা ঠেকুয়া খাবুনি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল সে। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—"মাই হামভি তোর বেটা ছি।"

খুব খুশী হইল সমুন্দরি। বলিল, "তাহলে এই প্রসাদগুলো তুই সকলের মধ্যে বেঁটে (ভাগ করে') দে।"

"জরুর।"

রণছোড় কয়েকখানা খাবুনি তুলিয়া অধিকলালের ঘরের ভিতরই প্রবেশ করিল।

"তোমরা সব খেয়েছ?"

জ্ঞান বলিল—'বিলট্ ঝা খায় নি। ও দোসাদের ছোঁয়া খাবে না'।

"ই-স"

রণছোড় ফোঁস করিয়া উঠিল।

"চৌবাচ্ছার যে জলে রোজ 'আস্নান' (স্নান) কর সে জল কে তোলে? দোসাদ রণছোড়। যে বাসনে রোজ খাও সে বাসন কে মলে (মাজে)? দোসাদ রণছোড়। দোসাদের ছোঁয়া ছটের 'পরসাদ' তুমি খাবে না? লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হচ্ছে তোমার! 'মন্ যব চাংগা কঠৌতিমে গঙ্গা' (মন শুদ্ধ থাকলে বাটির জলও গঙ্গাজল বলে' মনে হয়) এ কথা কি তুমি জান না?"

অধিকলাল হঠাৎ রুখিয়া দাঁড়াইল।

"ওর যখন প্রবৃত্তি হচ্ছে না তখন জোর করে' ওকে খাওয়াবার দরকার কি। ওর টেবিলে একটা রেখে দাও ওর ইচ্ছে হলে খাবে না হলে খাবে না।"

বিলট্ ঝা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"দাও, দাও খাচ্ছি।"

বিলট্ ঝা একটা খাবুনি লইয়া গপগপ করিয়া খাইতে লাগিল।

সমুন্দরি বলিল মাস্টারবাবুদের বাড়িতে গিয়াও সে প্রসাদ দিয়া আসিবে।

অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে শুনিয়া বোডিংয়ের সুপারিন-টেণ্ডেন্ট আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিলেন। তাহাদের দেওয়া প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া তাহাদের সামনেই একটু ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন।

বলিলেন, "চমৎকার হয়েছে, সবটাই খেয়ে ফেলতুম। কিন্তু আমি পেটরোগা লোক।"

এক পণ্ডিতজি ছাড়া সব মাস্টারই পরমানন্দে ছটের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। পণ্ডিতজি একটি ঠেকুয়া মাথায় ঠেকাইয়া সেটি রণছোড়কেই দিয়া দিলেন—"তোহি খা যা" (তুইই খেয়ে ফেল)

অধিকলাল মা ও বাবাকে লইয়া একটু যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বরাবরই একটু মুখ-চোরা প্রকৃতির, এভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া সে যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"বেকার ঠেকুয়া লে করি কে কি সব হাল্লা মাচাইছি"।

(ঠেকুয়া নিয়ে কি সব বাজে হইচই করছিস)

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টি রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হামরা খুশি।"

রংলাল মুখ কাচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে-ও একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু কিছু বলে নাই। এইবার বলিল—"আব তো সব ভে গেল। আব ঘর চ—"

"তু চুপ র। অব চল্ হেডমাস্টার বাবুকা পাস। খুদরু তু চল হামারা সাথ।"

(তুই চুপ কর। এবার চল হেডমাস্টার বাবুর কাছে। খুদরু তুই সঙ্গে চল—)

অধিকলাল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"নেই হাম্ নেই যাইবো।"

(না, আমি যাব না)

"কাহে ? তো কো যানেই পড়তে"

(কেন ? তোকে যেতেই হবে)

অধিকলাল ইতস্তত করিতেছিল কিন্তু সমুন্দরি তাহাকে হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। হেডমাস্টার মহাশয় বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সমুন্দরি ও রংলালকে খুব খাতির করিলেন। চেয়ারে বসিতে দিলেন। চেয়ারের সামনে ছোট একটি টেবিল দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা আনাইয়া চিনেমাটির প্লেটে খাইতে দিলেন। জল দিলেন কাচের গ্লাসে। সমুন্দরি এতটা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করে নাই। সে অভিভূত হইয়া পড়িল। রংলাল প্রথমে চেয়ারে বসিতে চাহে নাই। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে বসিতে হইল। হেডমাস্টার মহাশয় ভালো হিন্দী জানিতেন না। তিনি সমুন্দরিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"আপ রত্ন-গর্ভা হেঁ। অধিকলাল খুব ভালো ছেলে হ্যায়।"

সমুন্দরি উত্তরে বলিল—"বড়া 'ভিতরগুম্‌মা' (ভিতর-বুঝে) ছে, মাস্টার সাহেব"

হেডমাস্টার 'ভিতরগুম্‌মা' বুঝিলেন না। সহাস্যবদনে বলিলেন—"সব ঠিক হয়ে যাবে। উন্নতি করবে ও জীবনে।"

অধিকলালকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা বাবাকে ভক্তি কোরো। ওঁদের মনে কোনও কষ্ট দিও না।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার মাকে সহসা সে যেন নূতন রূপে আবিষ্কার করিল। যে মা রামগোবিনের গোলায় গহুম

ফাটকায়, সেই ব্যক্তি আর এই ব্যক্তি এক? কেমন স্বচ্ছন্দে গর্বিত ভাবে হেডমাস্টার মহাশয়ের সামনে চেয়ারে বসিয়া আছে। মায়ের দিকে চাহিয়া সত্যই সে বিস্মিত হইয়া গেল।

৬

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পরই অধিকলালের বিবাহ হইয়া গেল। যদিও ডাক্তারবাবু বেশী খরচ করিতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুন্দরি তাঁহার মানা শোনে নাই। বেশ ধুমধাম করিয়াই প্রথম পুত্রের বিবাহ দিল সে। তখন লাউডস্পীকারের প্রচলন হয় নাই। তবু ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি এবং রামশিঙা বাজাইয়া চতুর্দিক সচকিত করিয়া তুলিল সমুন্দরি। অনেক 'গোতিয়া' (আত্মীয়) আসিয়া পুরি (লুচি), তরকারি, দহি (দই), বুনিয়া (বোঁদে) এবং 'লাড্ডুর' (মণ্ডার) ভোজ খাইল। দোসাদ সমাজে একটা ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সমুন্দরি যে এতটা করিতে পারিবে তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই। শুধু ইহাই নয়, সে ভগবতী দেবীর জন্য একটি ভাল শাড়ী, ডাক্তারবাবুর জন্য ভাল ধুতি-চাদর তন্নুর জন্য একটি রঙীন শাড়ি এবং নখুর জন্যও একটি ধুতি কিনিয়া আনিয়া এক ডালিয়া খাবার সহ মাইজিকে 'পরণাম' (প্রণাম) করিতে গেল। গিয়া খুব বকুনি খাইল। ডাক্তারবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন। সমুন্দরির এই সব বাহাদুরি দেখিয়া তিনি খুব রাগারাগি করিতে লাগিলেন। সমুন্দরিকে প্রশ্ন করিলেন টাকা লইয়া এমনভাবে ছিনিমিনি খেলার মানে কি। সমুন্দরি সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হামার খুশি বাবু। গালি নেহি দে, দোয়া মাঙেই ছি।"

(আমার খুশি বাবু। গাল দিও না, আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি)

সমুন্দরির মলিন বসন দেখিয়া ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—"তুই নিজে তো ভাল কাপড় পরিস নি—"

"না মাইজি। পয়সা ওরাই গেলে। খুদরুয়াকো বাপ রো বাস্তে, লাল পাগড়ি—"

বলিয়াই সে ঘাড় ফিরাইয়া মুখে কাপড় ঢাকা দিল। হঠাৎ লজ্জা হইল তাহার। রংলালের জন্য সে একটি লাল পাগড়ির কাপড় কিনিয়াছিল, এ কথাটা বলিতে পারিল না সে। রংলাল যে সেই লাল পাগড়ি পরিতে চাহিতেছে না এ কথাও সে বলিতে পারিল না।

"তুই এত টাকা পেলি কোথা"

"কর্জা করলি"

(ধার করেছি)

"কর্জা করে' করছিস, কর্জা শুধবে কে"

"খুদরুবা, আর কে। উ যব হাকিম বনতে তব শোধ করতে"

(খুদরুবা, আর কে। ও যখন হাকিম হবে তখন শোধ করবে)

"ও যে হাকিম হবে তা তোকে কে বললে"

"হাম জানৈছি"

(আমি জানি)

"হাকিম হওয়া কি মুখের কথা! সেই ভরসায় তুই কর্জা করছিস"

"জরুর"

ডাক্তারবাবু সমুন্দরির দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মনে মনে কৌতুকবোধ করিলেন। কিছু না বলিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন তিনি।

ভগবতী দেবী বলিলেন—"তোকে আমি একটা নতূন শাড়ি দিচ্ছি। এটা তুই পরবি। তোর বউয়ের শাড়ি তো পাঠিয়ে দিয়েছি। পছন্দ হয়েছে ?"

"হাঁ বড়া বঁঢ়িয়া রেশম ছে—"

(হ্যাঁ, খুব সুন্দর। রেশম তো)

"তোর বউয়ের নাম কি"

"ফুলেশ্বরী"

"বাঃ, বেশ বাহারের নাম তো। বউ পছন্দ হয়েছে?"

"জিদ্দি মালুম হৈ ছে—"

(মনে হচ্ছে জিদি)

"কি করে' বুঝলি"

সমুন্দরি বলিল, রাত্রে পুরি দিলাম। বউ বলিল, পুরি আমি খাইব না। কিছুতেই খাইল না। ভাত চাই। অত রাত্রে শেষে ভাত রাঁধিয়া দিতে হইল। ওইটুকু মেয়ে, তার জেদ দেখ! ওকে ঢিট্ করিতে সময় লাগিবে।

অধিকলালের কিন্তু ফুলেশ্বরীকে ভালই লাগিল। কতই বা বয়স। বারো তেরোর বেশী নয়। কিন্তু সকলেই তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—ফুলের মালাগাছি, বিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে করে না স্নেহ। তন্নু ঠিক খবরই দিয়াছিল। ডান চোখটা সামান্য টেরা। কিন্তু তাহাতে খুব খারাপ দেখাইতেছে না তো, তাহার তো বেশ ভালই লাগিল। স্থলিয়া তিলিয়া দুইজনেই বলিল বউ নাকি বেশ রাগী। তাহারও সে কথা মনে হইয়াছে। বিছানায় বাঁকিয়া শুইয়াছিল। সে যখন বলিল 'সিধা হোক হটকে শুতো' (সোজা হয়ে সরে' শোও) তখন সে সরিয়া শুইল না। তাহার পর অধিকলাল যখন তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল তখন সে বলিয়া উঠিল—'ভক্' (যাঃ—) একটু রাগীই। কিন্তু অধিকলালের তবু খারাপ লাগে নাই। ভালই লাগিয়াছিল। বিবাহান্তে সে যখন কলেজে গিয়া ভরতি হইল তখনও মাঝে মাঝে ফুলেশ্বরীর স্বপ্নটা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িত।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।

মনে হইত :—

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হোক।

কিছুদিন পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইল। অধিকলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। দুইটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মেডেলও পাইয়াছে সে। সংস্কৃতে এবং বাংলায় 'লেটার'। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তপনবাবু তাহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন। ভরতি করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সে ইডেন হিন্দু হোস্টেলেও ভরতি হইতে পারিত। কিন্তু সে মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি ছোট মেসে গিয়া উঠিল। সেই মেসে তাহার বন্ধু জ্ঞান বসাকও ছিল। সে ভরতি হইয়াছিল বঙ্গবাসী কলেজে। থার্ড ডিভিসনে কোনরকমে পাস করিয়াছিল সে। পাঁচ ছয়টি গরীব ছেলে মেসের একতলায় তিনটি ঘরে থাকিত। বাড়িওলা থাকিতেন দ্বিতলে। হঠাৎ একদিন বাড়িওয়ালার সহিত দেখা হইয়া গেল অধিকলালের।

"অখিলাল তুমি এখানে ? চিনতে পারছ আমাকে ?

অধিকলাল চিনিতে পারে নাই। জ্ঞান বসাক পারিল।

"আরে যোগেন যে। তুমি এখানে!"

"এটা তো আমারই বাড়ি। আমি দোতালায় থাকি। দেশে গিয়েছিলাম আজ ফিরেছি। নীচের তলার মেসটা অনেকদিন থেকে আছে, বাবার আমোল থেকে। তোরা এই মেসে জুটে যাবি তা ভাবতেই পারি নি—"

অধিকলাল সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—"তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

"তিনি মারা গেছেন!"

"ও। তুমি কোথায় পড়ছ ?"

"আমি আর পড়ছি না। ব্যবসা করি। ওপরে থাকি, আর দোকানে যাই।"

"কিসের দোকান—"

"কলেজস্ট্রীটে বইয়ের দোকান করেছি একটা। তুমি ?"

"আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েছি এবার!"

"ইডেনে জায়গা পেলে না বুঝি—"

"পেয়েছিলাম কিন্তু ওখানে বড্ড বেশী খরচ। আমি চালাতে পারব না। তারপর জ্ঞানের সঙ্গে দেখা হল—এই মেসেই চলে' এলাম!"

হঠাৎ যোগেন অধিকলালের দুই হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"তোমার কথা আমি ভুলি নি ভাই। তুমি আমার বাড়িতে এসেছ এতে আমি কি যে খুশী হয়েছি তা তোমাকে কি বলব। নীচের ঘরে তোমার কষ্ট হয় তুমি আমার উপরের ঘরে এসে থাক। আমি ওপরে একা থাকি—বিয়ে থা করি নি—"

অধিকলাল মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন!"

যোগেন আরও বার কয়েক তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু অধিকলাল উপরের ঘরে গিয়া যোগেনের স্বাচ্ছন্দ্যে ভাগ বসায় নাই।

[এইখানে খানিকটা উইপোকায় নষ্ট করিয়াছে। এইটুকু মাত্র পড়া যায়]

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধিকলাল একটি অদ্ভুত জীবরূপে গণ্য হইয়াছে। রসিক বাঙালী সহপাঠীরা নানা রকম নামকরণ করিয়াছে তাহার। অনেকেই আড়ালে তাহাকে 'জন্তু' বলিয়া ডাকে। 'ধিক ধিক' নামকরণও করিয়াছে কেহ কেহ। তাছাড়া সে যে ছাতুখোর ইহা লইয়াও তাহাদের মধ্যে রসিকতার অন্ত নাই। 'রুফু' 'আমব্রেলু' 'যবচূর্ণ' প্রভৃতি নানা নামে ডাকে তাহারা তাহাকে। অধিকলাল যদি রাগারাগি করিত তাহা হইলে তাহারা জো পাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকলাল রাগিত না, হাসিত। একদিন একটি ছেলেকে কেবল বলিয়াছিল, এসো আমরা দু'জনে ভাব করি—আমি সাতু তুমি ভাতু। চমৎকার মিল আছে।

[ইহারও পরে খানিকটা নাই.........]

একদিন একটি ছেলে তাহার টিকি কাটিয়া লইয়াছিল। অধিকলাল নাকি হাসিয়া বলিয়াছিল, "টিকি আবার গজাবে। কিন্তু তুমি আর গজাতে পারবে কি? নিজেকেও তুমি কেটে ফেলেছ যে—"

[যে যে অংশ নাই তাহা কেবল ... এই চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করিলাম]

... ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অধিকলাল এবার ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার সহিত ব্র্যাকেটে আর একটি ছাত্রও এ সম্মান পাইয়াছে। তাহার নাম জ্যোতির্ময় রাহা। গুজব রটিয়াছে যে জ্যোতির্ময় জনৈক নামজাদা প্রফেসারের পুত্র বলিয়া তাহাকে

জোর করিয়া অধিকলালের পাশে বসানো হইয়াছে। আসলে ছেলেটি নাকি তত ভালো নয়। অন্যান্য বিষয়ে মোটেই ভালো নম্বর পায় নাই। তবে এটা গুজবও হইতে পারে। কারণ অধিকলাল নিজে বলিল, জোতির্ময় ইংরেজিতে সত্যই খুব ভালো ছেলে। সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইয়াছে, এবং বউ লইয়া খুব মাতামাতি করিয়াছে, তাই পরীক্ষায় খুব ভালো ফল হয় নাই। পরীক্ষার আগেও বই ছোঁয় নাই। বউকে দৈনিক দু'খানা করিয়া চিঠি লেখে নাকি। একটা গদ্যে, আর একটা পদ্যে। তাহার স্ত্রীর চিঠিও জ্যোতির্ময় তাহাকে দেখাইয়াছে। গোলাপী কাগজের উপর সবুজ কালিতে লেখা। চমৎকার চিঠি। ফুলের মতো যেন—এই উপমাটাই অধিকলালের মনে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিজের বউ ফুলেশ্বরীকেও মনে পড়িয়াছিল তাহার। মনে হইয়াছিল, এখন নিশ্চয় আরও বড় হইয়াছে। এখনও তো 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। এ কথাও তাহার মনে হইয়াছিল নাম যদিও ফুলেশ্বরী কিন্তু অমন ফুলের মতো চিঠি লিখিতে পারিবে? চিঠি যদি নাও লেখে... ... ...

অধিকলালের প্রকৃত বন্ধু ছিল দুইজন। একজন বাংলাদেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আর একজন আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন্। যখনই তাহার জীবনে কোনও সমস্যার উদ্ভব হইত তখনই সে ভাবিবার চেষ্টা করিত এ অবস্থায় পড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বা আব্রাহাম লিংকন্ কি করিতেন। আর সে ভক্তি করিত রবীন্দ্রনাথকে। রোজ সকালে উঠিয়া সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করিয়া পড়াশোনা আরম্ভ করিত।

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এই কবিতাটি তাহার প্রিয়তম কবিতা। এটি সে আবৃত্তি করিত প্রত্যহ সকালে।... ... ...

...ছাতু খাইয়া আজকাল থাকে সে। মেসে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি প্রাইভেট ট্যুশনিও লইয়াছে। তাহার ভাই আজবলালকে পড়াইবার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে হয়। সেদিন মায়ের জন্য একটি শাড়ি কিনিয়া পাঠাইয়াছে, বাবার জন্যে একটি কামিজ। এজন্য যোগেনের নিকট কিছু ধার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরের মাসেই সে ধার শোধ করিয়া দিয়াছে। যোগেন টাকা ফেরত লইতে চাহে নাই, কিন্তু অধিকলাল না ছোড়।

... ...

সেদিন একজন প্রফেসর নাকি তাহাকে বলিয়াছেন তোমার 'অধিকলাল' নামটা বদলাইয়া ফেল। ও নামের কোনও অর্থ হয় না, শুনিলে হাসি পায়। তোমার রং কুচকুচে কালো, তোমার নাম অধিকলাল মানায় কি? অধিকলাল সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিল আমার বাবার রাখা নাম আমি কি বদলাইতে পারি? নামের সহিত লোকের জীবনের মিল হয় না সব সময়ে। আপনার নাম যজ্ঞেশ্বর, আপনি কি—। যজ্ঞেশ্বরবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—ঠিক বলেছ, আমার নাম হওয়া উচিত ছিল কীটাণুকীট। তাঁহার পেপারে অধিকলাল পরের বার কিন্তু খুব কম নম্বর পাইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবু বিদ্বান লোক, প্রফেসারও ভালো, কিন্তু উদার নন। অধিকলাল কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। সে একদিন যোগেনকে বলিয়াছিল—'আমি ওঁকে ভক্তি করতে চাই, কিন্তু পারিনা। সেটা আমারই অক্ষমতা। হিমালয় পাহাড়ে কি সবাই উঠতে পারে? আমি... ... ...

অধিকলাল কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার বাবা রংলাল আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রংলালের চেহারা সামান্য

কুলির মতো। কাঁচা-পাকা গোঁফ। মাথার চুলও কাঁচা-পাকা। যোগেন তাহাকে প্রথমে আমোল দেয় নাই। সে যখন বলিল অধিকলালের বাবা সে, তখনও কথাটা বিশ্বাস করে নাই। জ্ঞান কিন্তু অধিকলালের বাবাকে চিনিতে পারিয়াছিল। সমুন্দরি আর রংলাল যখন খাবুনি লইয়া বোর্ডিংয়ে গিয়াছিল তখন জ্ঞান ছিল, যোগেন ছিল না। রংলালের চেহারায় এই কয় বৎসরে বয়সের ছাপ পড়িয়াছে। মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তাহার মুখের সেই অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত হাসিটা কিন্তু ঠিক আছে। এই হাসিটি দেখিয়াই জ্ঞান তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। রংলাল অধিকলালের কাছে একটি বৈষয়িক প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিলিয়া এবং স্থলিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। একটি সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের দুইটি ছেলেকে সমুন্দরি পছন্দ করিয়াছে। পাত্র-পক্ষও আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে তিলিয়া স্থলিয়াকে। খবর পাঠাইয়াছে যে তাহারা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছে যদি রংলাল তাহার দুই মেয়েকে এক এক হাজার টাকার জেবর (গহনা) দেয়। ইহা ছাড়া পাত্র দুইটিকেও সোনার হাতঘড়ি, সাইকেল, ভালো রেশমের জামা ও মূল্যবান জুতা দিতে হইবে। এসব ছাড়াও শাশুড়ী-জাতীয়া প্রণম্যাদের জন্য কাপড় আছে, গোতিয়াদের (কুটুম্বদের) ভোজ আছে, বাজা-বাজনা আছে (সমুন্দরির খুব ইচ্ছা বিবাহে লাউড-স্পীকার সহযোগে গান বাজানো হয়)—কিন্তু এ সবের জন্য টাকা দরকার। অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা। রামগোবিন টাকা দিবে বলিয়াছে। কিন্তু সে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া তবে টাকা দিবে। অধিকলালের বিবাহেও দুই হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সে টাকাও রামগোবিন দিয়াছিল। সে টাকার জন্যও হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে। রামগোবিন বলিয়াছে অধিকলালকেই হ্যাণ্ডনোটে সই করিতে হইবে। তাছাড়া রংলালকে দিতে হইবে টিপসই।

রংলাল হ্যাণ্ডনোটটি লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। অধিকলালের সই চাই। রামগোবিন রংলালের উপর কিঞ্চিৎ কৃপাও যে করে নাই তাহা নহে। সে বলিয়াছে যে যেহেতু রংলাল তাহার পুরাতন 'দোস্ত' সেহেতু সে তাহার নিকট হইতে সুদ লইবে না। অধিকলাল নীরবে সব শুনিল, তাহার পর হ্যাণ্ডনোটখানা পড়িল। বলিল, "আমি তো এখনও কিছু রোজগার করতে পারি না, পরে কত রোজগার করতে পারব তাও জানি না, ধার যদি শোধ না করতে পারি তাহলে কি হবে?" রংলাল অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর বলিল—"রামগোবিনই আমাকে কিছুদিন আগে তার জমির পাশে পাঁচ বিঘে জমি কিনে দিয়েছিল। আমি প্রতি মাসে খেটে খেটে সে জমির দাম উসুল করেছি। এখন আমিই সে জমির মালিক, টাকা যদি শোধ না হয় সেই জমিই রামগোবিনকে দিয়ে দেব। এর জন্যে আর একটা বন্ধকী দলিলও করতে হবে। তুমি এখন এই কাগজটায় সই করে' দিলেই রামগোবিন টাকা দিয়ে দেবে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হ'য়ে যাক তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। সবই ভগবানের হাত।"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল তাহার পর সই করিয়া দিল।

তাহার পর বলিল—বাবু, চল তোমাকে ভালো শরবত খাওয়াই। কাছেই খুব ভালো একটা শরবতের দোকান আছে।

যোগেন বলিল—চল না একটা ভালো হোটেলে যাওয়া যাক—।

অধিকলাল হাসিয়া উত্তর দিল—বাবু মাছ মাংস খান না। হোটেলে গিয়ে কি হবে। তার চেয়ে বরং কোনও দোকান থেকে ভালো মালপোয়া কিনে... ... ...

একদিন মেসে হইহই পড়িয়া গেল। অধিকলাল বাংলায় কবিতা লিখিয়াছে একটা। চমৎকার কবিতা। সকলে প্রশংসা করিতে

লাগিল। কলেজের একজন অধ্যাপকও বলিলেন—'চমৎকার হয়েছে কবিতাটা। এটা কোনও ভালো মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দাও।' তিনি সেকালের একটা নামজাদা মাসিকপত্রিকার নাম করিলেন। অধিকলাল যোগেনকে বলিল, "আমার ভাই কোনও পত্রিকায় পাঠাতে লজ্জা করে।" যোগেন খুব বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল। সে বলিল, "তোমাকে পাঠাতে হবে না, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। ও পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। তুমি দাও আমাকে কবিতাটা।" তাহার পর দিন যোগেন মহানন্দে আসিয়া খবর দিল—কবিতা ওঁদের খুব ভালো লেগেছে। পরের মাসেই প্রকাশিত হবে। তুমি আরও কবিতা লেখ। ওঁরা ছাপাবেন বলেছেন। তুমি সাহিত্য-জগতে যদি নাম করতে পার, তাহলে তোমার জীবনের রং বদলে যাবে। কথাটা শুনিয়া অধিকলালের মনেও বোধহয় একটা স্বপ্ন জাগিয়াছিল। সে কল্পনা করিয়াছিল হয়তো তাহার ছবি কাগজে বাহির হইবে, হয়তো তাহার বই ছাপিবার জন্য প্রকাশকেরা তাহার কাছে ভিড় করিবে, হয়তো তাহার নিকট বাণী লইবার জন্য কলেজের ছেলে-মেয়েরা ভীড় করিবে, হয়তো নানা সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ আসিবে তাহার নিকট, তাহার বাণী তাহার বক্তৃতা তাহার কবিতা হয়তো দেশকে নূতন পথ দেখাইবে, নূতন প্রেরণা দিবে, নূতন যুগের কবি হিসাবে তাহার নাম হয়তো আগামী যুগের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে—এই ধরনের বহু বর্ণবহুল 'হয়তো' বোধহয় তাহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলে নাই। পরের মাসে সেই বিক্ষাত মাসিকপত্রে কবিতাটি প্রকাশিত হইল না। তাহার পরের মাসেও না। তাহার পরের মাসে যাহা ঘটিল তাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। অন্য একটি কাগজে কবিতাটি প্রকাশিত হইল ভিন্ন

নামে। কবির নাম অধিকলাল নয়, অমিত সিংহ। যোগেন বিখ্যাত কাগজের আপিসে গিয়া খবর লইয়া জানিল জনৈক যুবক একদিন আপিসে গিয়া কবিতাটি নাকি লইয়া আসিয়াছে, বলিয়াছে সেই নাকি কবিতাটির রচয়িতা, তাহার ইচ্ছা কবিতাটি অন্য কাগজে দিবে বলিয়া সে ঠিক করিয়াছে। তাহার বন্ধু সহকারী সম্পাদক বলিলেন, 'সুতরাং তাঁকে কবিতাটি দিয়ে দিয়েছি। তারপর তা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা জানিনা। ও সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বও আমাদের নেই'। ক্রুদ্ধ যোগেন আসিয়া একজন উকিলের পরামর্শ লইয়াছিল, উকিল উকিল-সুলভ পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আদালতে যদি প্রমাণ করা যায় লেখাটি আপনার বন্ধুর তাহলে খেসারত আদায় করা যেতে পারে। এর জন্যে সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, দরকার হলে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করতে হবে। ওই অমিত সিংহ নিশ্চই বলবে কবিতাটি তারই লেখা অধিকলালই সেটি চুরি করে' টুকে নিয়ে ছাপতে দিয়েছিল অন্য কাগজে। সেও ছাড়বে না, সেও সাক্ষী তৈরী করবে। সুতরাং আদালতে না গেলে বোঝা যাবে না কেস আমরা জিতব কি না'। অধিকলাল যোগেনকে আদালতে যাইতে দেয় নাই। সাহিত্যিক হইবার স্বপ্নও তাহার নিবিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে সাহিত্যের হাটেও চোর, বাটপাড়, পকেটমার আছে, সাহিত্যের ফসলও ঠিক ন্যায়ের বাটখারায় মাপা হয় না সাহিত্যের হাটে। সেখানেও অসাধুদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়...না, সে ওসব করিবে না, করিবার প্রবৃত্তি নাই।.........

অনেকদিন পরে যোগেনকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহাতে যে খবরটি আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। অধিকলালের মতো ছেলেও কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে নাই। কামনার পঙ্ক তাহার মনেও লাগিয়াছিল। সে লিখিতেছে—'ভাই যোগেন, তুমি বিপথে গেছ বলে' অনুতাপ

করেছ অনেক এবং আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করে' যা যা লিখেছ তাতে আমার গর্ব অনুভব করা উচিত। কিন্তু ভাই, যদিও বিপথে যাওয়া যাকে বলে তা আমার জীবনে ঘটে নি, কিন্তু সত্যি কথা যদি বলি তাহলে স্বীকার করতেই হবে ও পাপ আমার মনকেও একদিন স্পর্শ করেছিল। জীবু, বরেন, রহিম এরা আমার সহপাঠি ছিল। এদের কাছ থেকে আমি পর্ণোগ্রাফির অনেক বই পেতাম এবং লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। বলতে যদিও লজ্জা করছে তবু বলব পড়তে ভালোই লাগত। নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করেছিলাম। পুরুষের সদ্যজাগ্রত কামনা নিয়ে বিচরণ করতাম সে জগতে। দেহের শিরা-উপশিরা উত্তেজনায় দপ দপ করত। আমাদের ক্লাসের কালো সুঁটকো মেয়েটাকেও মনে হত অপ্সরী। ইচ্ছে করত তার সঙ্গে ভাব করি। মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে বলি—

ফেল গো বসন ফেল ঘুচাও অঞ্চল
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন-আবরণ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই শেষে আমাকে রক্ষা করলেন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম এই কাম-লোকে আমি শাশ্বত ভারতের সন্ধান পাব না, যে ভারতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সতীত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' বইটিতে 'সতী' নামে যে কবিতাটি আছে সেটি পড়েছ কি? তার প্রথম দু'লাইন হচ্ছে—

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরানে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা

এই কবিতায় তিনি বলেছেন সতীদের মধ্যে কলঙ্কিনীরাও আছে। কারণ অন্তর্যামীই সতীত্বকাহিনীর মর্মকথা জানেন। সে মর্মকথা আর যাই হোক তা কাম নয়। তা প্রেম। হঠাৎ আমার স্ত্রী ফুলেশ্বরী এসে যেন আমার সেই গোপন লোকে প্রবেশ করল। হাসিমুখে চাইল আমার দিকে একবার তারপর, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিল

সব। আমার ঘোর কেটে গেল। আমার বিশ্বাস তোমারও যাবে... ... ...

অধিকলাল সসম্মানে বি, এ, পরক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরীক্ষার সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সে খুব ভালো পরীক্ষা দিতে পারে নাই। অসুস্থ না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে তাহার নাম থাকিত। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই একটা মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটিল। তাহার বাবা রংলাল হঠাৎ মারা গেল। অধিকলাল যে বি, এ, পাস করিয়াছে এ খবর সে শুনিয়া যাইতে পারে নাই। তিলিয়া স্তুলিয়ার বিবাহের পর অধিক উপার্জনের আশায় সে রামগোবিনের চাকরি ছাড়িয়া কাটিহারে একটি মিলে কাজ লইয়াছিল। মিলের চাকায় কাপড় আটকাইয়া গিয়া অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। খবর পাইয়া অধিকলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে তাহার বাবাকে দেখিতে পায় নাই।

মিলের মালিকরা নাকি রংলালের পরিবারকে হাজার দুই টাকা খেসারতস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরি পাইয়াছে টাকাটা। রামগোবিন বলিয়াছিল টাকাটা আমাকে দাও আমি ঋণের দলিলে উস্থল করিয়া লইব। সমুন্দরি দেয় নাই। বলিয়াছিল, ঋণ যথাকালে খুদরুবা শোধ করিবে। যদি না করে তখন আদালত আছে, সেখানে গিয়া যাহা খুশি করিও, এ টাকা আমি দিব না। অধিকলাল সব শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিল সে। রণছোড় আসিয়া রামগোবিনের গোলায় চাকরি করিতেছে। সকরিগলিতে তাহার বাড়ি ছিল। কলেরায় তাহার বউ ছেলে-মেয়ে সব নাকি মরিয়া গিয়াছে। বেশী দিন কামাই করার জন্য সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংয়ের চাকরটিও আর নাই। সুতরাং রংলালের বাড়ির পাশেই সে ছোট একটু ঝোপড়ি (কুঁড়ে) বানাইয়া লইয়াছে। সমুন্দরিই দুই বেলা তাহাকে খাইতে দেয়, অবশ্য বিনা পয়সায় নয়, এজন্য

তাহাকে মাসে পনেরো টাকা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে রণছোড়ের সুবিধাই হইয়াছে। সে রামগোবিনের কুলি কন্ট্রাক্টেও কাজ করে, গোলাতেও করে। তাহার মহিষের মতো স্বাস্থ্য, মহিষের মতো খাটিতে পারে সে। সবসুদ্ধ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা পোস্টাপিসে জমায়। অধিকলালকে দেখিয়া সে খুব আনন্দিত হইল। অধিকলাল বি, এ, পাস করিয়াছে শুনিয়া প্রশ্ন করিল—'আব কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জকা স্কুল মে যো হেডমাস্টার ছেলৈ—উ ভি বি, এ, পাস—তু হেডমাস্টার বনি যা—'

["এখন কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টারও বি, এ, পাস ছিল, তুই হেডমাস্টার হ'য়ে যা—"]

সমুন্দরি সেখানে ছিল। সে সগর্বে বলিল—"মাস্টার কাহে, উ হাকিম বনতে"

[মাস্টার কেন, ও হাকিম হবে]

তাহার পরই অধিকলালের 'গওনা'র (দ্বিরাগমনের) প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল।

অধিকলাল বলিল, না আমি রোজগার না করা পর্যন্ত বউকে আনিব না। তাহাকে খাওয়াইব কি? সমুন্দরি উত্তর দিল—'হাম্ খিলাইব। বহুকো দু মুঠ্ঠি ভাত দেনে কো তাগদ হামরা ছে।"

[আমি খাওয়াব। বউকে দুমুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা আমার আছে]

অধিকলাল গিয়া দেখিল আজবলাল একটি অকাল কুষ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ঘাড় চাঁছা, লম্বা জুলফি, চবর চবর করিয়া পান চিবাইতেছে, পরনে শৌখিন ধুতি এবং চপ্পল। এবারও পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে।

অধিকলাল মাকে বলিল—"এক্রা পঢ়াকে কী নাফা হোতে? কোই কাম মে লাগা দে—"

[একে পড়িয়ে লাভ কি! কোনও কাজে লাগিয়ে দে]।

সমুন্দরি ছেকা-ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম—"সবার বুদ্ধি কি একরকম হয়? এবার ফেল করিয়াছে, আগামী বার পাস করিবে। ও কি এখন আর মজুরের কাজ করিতে পারিবে? লেখাপড়া শিখিয়া উহাকে বাবু বনিতে হইবে। হাকিম হইতে না পারে, কিন্তু হাকিমের কেরানীও কি হইতে পারিবেনা?"

ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও গেল অধিকলাল। তাহাকে দেখিয়া সেখানে সবাই মহা খুশী। নখু ছিল না, সে-ও কলেজে পড়িতেছে। কলিকাতায় তাহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা হয় তাহার। তনুকে দেখিয়া সে কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কি সুন্দর হইয়াছে সে। একটা পুষ্পিতা লতা যেন। অধিকলালকে দেখিয়া তাহার চোখ মুখ যদিও আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল কিন্তু কোনও প্রগলভতা প্রকাশ করিল না সে। আগে সে অধিকলালের হাত ধরিয়া টানাটানি করিত এখন দূরে সরিয়া রহিল।

"খুদরুদা, আশা করেছিলাম এবারও তুমি কম্‌পীট করবে—"

"অসুখে পড়ে' গিয়েছিলাম ভাই। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। পাস করেছি এই যথেষ্ট—"

তপনবাবু কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া অধিকলাল আশ্চর্য হইয়া গেল। তাঁহার মাথার সামনের দিকের খানিকটা চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। সেই শাদার মধ্যে সিঁদুরের শোভা যেন আরও মহিমাময় মনে হইল অধিকলালের। অনেক দিন আগে সে একবার শাদা স্তর-মেঘের মধ্যে সূর্যোদয় দেখিয়াছিল। সেই ছবিটা মনে পড়িল তাহার। ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কপালে চুম্বন দিলেন।

"তুই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিস খুদরু। আহা, রংলালের জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে। সে বেচারা চিরকাল কষ্ট করেই গেল, সুখের

মুখ আর দেখতে পেলে না বেচারা। কি খাবি? মাংস রেঁধেছি আজ। চারটি মাংস ভাত খেয়ে যা না এখানে দুপুরে—"

"এখন যে অশৌচ, মাংস খাব কি করে'—"

"ও ঠিক তো। তবে একটু ক্ষীর খাবি আয়।"

ক্ষীর এবং মুড়ি খাইতে খাইতে অধিকলাল প্রশ্ন করিল—"তন্নুর পড়াশোনা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। শ্বশুর খুব বড়লোক, জামাই বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।"

"বাঃ খুব আনন্দের কথা। বিয়ের সময় আমি আসব।"

"তোর বউ কবে আসবে? এতদিনে বড়সড় হয়েছে নিশ্চয়।"

"বউ এনে রাখবো কোথায় কাকীমা? আমি আগে রোজগার করি—"

"সমুন্দরি কিন্তু ওসব কথা শুনবে না। সে বলছিল সবাই নাকি নিন্দে করছে, সে বউকে এখানেই আনবে।"

"আপনারা মাকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। এখন বউকে নিয়ে এসে লাভ কি—"

"তোমার মা কি কারো কথা শুনবে? যা খাণ্ডারণী, ও নিজের মতে চলবে।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। অসহায় বোধ করিতে লাগিল একটু। কিন্তু ও বিষয়ে আর কিছু বলিল না।.........

....তপনবাবু রংলালের 'কিরিয়া'তে (শ্রাদ্ধে) পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিল রামগোবিনও কিছু দিবে। কিন্তু সে নাকি কিছুই দেয় নাই। সমুন্দরি তাহার গোলার কাজ ছাড়িয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী হরিবোল সার গোলায় কাজ লইয়াছিল। সে গতর খাটাইয়া খায়, কাহারও পরোয়া করে না। যখন তখন যেখানে সেখানে রামগোবিনকে

'চোট্টা বাভনা' বলিয়া উল্লেখ করিতেও ইতস্তত করে না সে। খুব ভোরে উঠিয়া এক গৃহস্থের বাড়িতে সে ঢেঁকিতে ধান, চাল, চিঁড়া প্রভৃতি কুটিয়া দেয়। ইহাতেও তাহার রোজগার হয় বেশ। কোন কোন দিন নিজের বাড়ির উঠানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে রংলালের জন্য কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে রংলাল তাহার মানা না শুনিয়া কাটিহারের মিলে গিয়া চাকরি লইয়াছিল। টাকার জন্যই সে প্রাণটা দিল! ওই 'চোট্টা বাভ্নার' দলিলই তাহাকে 'বাউলা' (পাগল) করিয়া তুলিয়াছিল, এক মুহূর্ত তাহার 'চেইন্' (শান্তি) ছিল না। রণছোড় তাহাকে সান্ত্বনা দিত।.......

অধিকলাল আই, এ, এস, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পাস করিল। ট্রেনিং লইবার জন্য দিল্লী যাইতে হইল তাহাকে। সমুন্দরির স্বপ্ন সফল হইল শেষ পর্যন্ত। এ সময় সে বেশ একটু অর্থকষ্টের মধ্যে ছিল। কারণ তপনবাবু লিখিলেন যে তাহার মায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা তিনি ব্যাংকে fixed deposit করিয়াছিলেন তাহা সমুন্দরি তুলিয়া লইয়াছে। আজবলাল সেই টাকা দিয়া একটি মনিহারী দোকান করিয়াছে বাজারে। পড়াশোনা ত্যাগ করিয়াছে। একজন স্কুলের মাস্টারকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া স্কুল হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। তপনবাবুই তাহাকে একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন তনু টাকাটা পাঠাইতেছে। বিবাহের সময় সে অনেক টাকা পাইয়াছিল। সেই টাকা হইতে সে তোমাকে টাকাটা উপহার দিতেছে। তুমি যেন আবার আত্মসম্মানের আধিক্যবশতঃ টাকাটা ফেরত দিও না। সে বড় দুঃখ পাইবে। তনুর স্বামীর দিল্লীরই কোনও কলেজে অধ্যাপক হইয়া যাইবার কথা। ঠিকানা এখনও

জানি না, পাইলে তোমাকে জানাইব। তুমি যখন ম্যাজিস্ট্রেট হইবে তখন যদি পূর্ণিয়াতে আস আমরা খুবই গর্ব অনুভব করিব। ইচ্ছা আছে গ্রামে একটা সভা করিয়া তোমাকে অভিনন্দন জানাইব। নখুও আগামী বৎসর অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিসের পরীক্ষা দিবে, অবশ্য যদি বি, এ, পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। আমার শরীরটা সম্প্রতি ভালো যাইতেছে না। হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগিতেছি। বিশ্রাম লওয়া উচিত, কিন্তু......

বছর দুই পরে অধিকলাল যখন পূর্ণিয়া জেলাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেল তখন ডাক্তার তপনকান্তি মারা গিয়াছেন। ভগবতী দেবী জব্বলপুরে তাঁহার বাপের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িটা শূন্য পড়িয়া আছে। নখু কলিকাতায়, তনু শ্বশুরবাড়িতে। নখুর ইচ্ছা বাড়িটা বিক্রয় করিয়া সেই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দেওয়া হোক। তপনবাবু 'খরচে' লোক ছিলেন, ব্যাংকে নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অঞ্চলে অনেকের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচুর শ্রদ্ধা জমা হইয়া আছে, কিন্তু তাহা দিয়া সংসার খরচ চলে না। প্রায় দশ বিঘা জমির উপর তপনকান্তিবাবুর বাড়ি। বিক্রয় করিলে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দিলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি থাকিতে পারিবেন। নখুর ইহাই মত।

রামগোবিন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া বাড়িটা কিনিতেও প্রস্তুত আছে। তনু কিন্তু ইহাতে মত দিতেছে না। তনুর মতের মূল্য আছে, কারণ তপনবাবু কোন উইল করিয়া যান নাই।

সুতরাং সেও ওই বাড়ির একজন উত্তরাধিকারিণীরূপে গণ্য হইবে। তনু বলিয়াছে যে ওই বাড়িতে তপনকান্তির নামে একটি হাসপাতাল করা হোক। তনুর স্বামীর একজন বন্ধু বিলাত-ফেরত ডাক্তার। সে গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস করিতে চায়। সন্ন্যাসীপ্রকৃতির লোক সে। বিবাহ করে নাই, করিবেও না। সে বলিয়াছে তপনবাবুর নামে যদি হাসপাতাল করা হয় তাহা হইলে সে গিয়া হাসপাতালের ভার লইবে। নখু এবং তনু দুইজনেই অধিকলালের পরামর্শ চাহিয়া তাহাকে পত্র দিয়াছিল। অধিকলাল উত্তর দিয়াছিল, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আমাকে জড়াইও না। তোমরা নিজেরাই পরামর্শ করিয়া যাহা ঠিক করিবার কর। যদি হাসপাতাল হয় আমি খুব সুখী হইব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে গভর্ণমেণ্টও এ ব্যাপারে কিছু আর্থিক সাহায্য করে। গ্রামে ভালো হাসপাতাল করা গভর্ণমেণ্টেরও অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে। জানি না কতদূর কি করিতে পারিব। নখু যাহা লিখিয়াছে, তাহাও অবশ্য উড়াইয়া দিবার মতো নহে। মায়ের নামে কিছু টাকা থাকিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন। নখু ভালো ছেলে, সেও ভালো চাকরি পাইবে, তখন মায়ের কোনও ভাবনা থাকিবে না। আমি নিজের তরফ হইতে এটুকু বলিতে পারি আমি যতদিন রোজগার করিব মাকে টাকার অভাবে কষ্ট পাইতে দিব না। আমি যতটা পারি তাঁহাকে সাহায্য করিব। তিনি শুধু তোমাদের মা নন, আমারও মা।.........

অধিকলালের কোয়ার্টারে ফুলেশ্বরী আসিয়াছে, সমুন্দরিও আসিয়াছে। অধিকলাল বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ফুলেশ্বরী বিদ্যায় গো-মূর্খ, কিন্তু তাহার চালচলন ঠাট্‌ঠমক মেমসাহেবের মতো। বগল-কাটা লো-নেক্ (low neek) জামা পরিয়াছে,

পায়ে দিয়াছে হাই-হিল জুতা, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্‌, মুখময় চুনকাম, চোখে বিলাতী কাজল। অধিকলালের মনে হইতে লাগিল যে একটা 'সং' ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুই-একটা ইংরেজি বুকনিও শিখিয়া নিজেকে আরও হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে সে। চাকরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'বুই' 'বুই' (Boy) বলিয়া ডাকিতেছে। অধিকলাল বলিয়াছিল 'তুমি তো মেমসাহেব নও। এ সব করিতেছ কেন? তুমি বিহারী, তুমি তোমার স্বাভাবিক পোশাকে থাক, মাতৃভাষায় কথা বল, তাহা হইলে তোমাকে আরও ভালো দেখাইবে'।

ফুলেশ্বরী কিন্তু এ সদুপদেশ শোনে নাই—এবং বিহারী সুরে টান দিয়া বলিয়াছিল—এঃ। যাহার বাংলা অর্থ—'ইস্‌'। সমুন্দরিও ফুলেশ্বরীর দিকে। সে বলিতেছে—"হাকিম কা জনানী কি মজুরনী কা এইসা রহিতে? জরুর উ ইন্‌সান্‌ বন্‌তে। হাকিম কা জনানী, খেলোড় ছে কি!'

[হাকিমের বউ মজুরনীর মতো থাকবে নাকি। ওকে ভদ্রলোকের মতো থাকতেই হবে। হাকিমের বউ, খেলা নাকি!]

সমুন্দরি কিন্তু হাকিমের মা সাজিতে চায় না। সে বাহিরের দিকে একটা ঘরে জাঁতা বসাইয়াছে। ডাল প্রস্তুত করে, ছাতু ও আটাও পেষে। যে ময়লা কাপড় সে আগে পরিত সেই ময়লা কাপড় এখনও পরে। মাথায় তেল দেয় না। খসখস করিয়া দুই হাত দিয়া মাঝে মাঝে মাথাটা চুলকায়—অর্থাৎ মাথায় যে অনেক উকুন আছে তাহা বেশ বোঝা যায়। সমুন্দরি লুকাইবারও চেষ্টা করে না। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। বাহিরের ঘরেই বেশীর ভাগ থাকে সে। ওই ঘরে বসিয়াই 'হুক্কা' খায়। পচ্‌ পচ্‌ করিয়া থুতুও ফেলে যেখানে সেখানে। চাকরবাকর খানসামা-বেয়ারাদের সঙ্গেই তাহার ভাব বেশী। তাহাদের সঙ্গেই

আড্ডা দেয়। মাঝে মাঝে ঝগড়াও করে। শাসায় তাহাদের—ফের যদি এমন করিস তোদের চাকরি খেয়ে দেব।

সমুন্দরির এই সব আচরণে অধিকলালের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। একদিন কমিশনার সাহেব তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বাড়ির দাইটাকে সামনের ঘরে থাকিতে দিয়াছ কেন। পিছনের দিকে তো উহাদের থাকিবার জন্য আলাদা ঘর আছে।" অধিকলাল খুব লজ্জিত হইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল, সে। বলিল, "উনি আমার মা। উনি ওইভাবেই থাকিতে চান। কি করিব বলুন—"।

কমিশনার সাহেব বাঙালী, সেকালের আই, সি, এস। একথা শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া বলিলেন—"ওহ্ আই সি! তোমার মা! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং সম্ভ্রমভরে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মাইজি, নমস্তে। সমুন্দরিও দুই হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিল বটে, কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল না। রোদে পিঠ দিয়া হুঁকা-হাতে যেমন রোদ পোহাইতেছিল তেমনি পোহাইতে লাগিল। কমিশনার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "মাইজি আপনি বাইরের দিকে এমন ভাবে বসে থাকেন কেন। ভিতরের দিকেও তো অনেক ঘর আছে।" ইহার উত্তরে সমুন্দরি সেই কথাগুলিই বলিল যাহা সে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেককে বলিয়াছে—

"হামারা খুশি—"

কমিশনার সাহেব মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের কাণ্ড দেখিয়া অধিকলালের কিন্তু লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কমিশনার সাহেব হাস্যদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে যে ঝলকটা সে দেখিয়াছিল তাহা ব্যাঙ্গের ঝলক। তিনি সুসভ্য বাঙালী-কুল-তিলক, বাহিরের ভব্যতা নিখুঁত, অনেক দিন বিলাতে ছিলেন। কিন্তু ওই ঝলক দেখিয়া মনে হয় মুখে তিনি যাহাই বলুন মনে মনে

ভাবিতেছেন—মেড়োদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। অধিকলালের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। মায়ের উপর একটু রাগও হইল। কিন্তু সেদিন সে কিছু বলিল না।

... ...

আকর্ণ দন্ত বিকশিত করিয়া রামগোবিন আসিয়া হাজির হইল একদিন। সঙ্গে প্রচুর 'ভেট' আনিয়াছিল সে। ভাল দই, ভাল চিঁড়া, মর্তমান কলা এক কাঁদি, দুইটা বড় বড় তরমুজ। অধিকলাল বলিল—এ সব ভেট আমি লইব না।

সমুন্দরি রুখিয়া উঠিল। ছেকা-ছেনি ভাষায় বলিল—নিবি না কেন? সব হাকিমই তো ভেট নেয়, তুই নিবি না কেন! অধিকলাল কিন্তু কিছুতেই লইতে রাজী হইল না। রামগোবিন ইহা প্রত্যাশা করে নাই। ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেল।

আফিস হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল তাহার মায়ের ঘরে রামগোবিনের 'ভেট' সাজানো রহিয়াছে। বড় বড় তরমুজ দুইটাই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"এ কি এগুলো রেখেছ কেন!"

"হামারা খুশি!"

তাহার পর ছেকা-ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম এই যে ওই 'চোট্টা বাভ্‌না' আমাদের বরাবর ঠকাইয়াছে। রংলালকে পুরা মজুরি কখনও দেয় নাই, আমি যখন মজুরির পরিবর্তে 'দানা' লইতাম তখন ওজনে কম দিত। রংললাকে ও যদি দলিলের নাগ-পাশে না বাধিত তাহা হইলে সে মিলে চাকরি করিতে ছুটিত না। এখন যখন উহাকে 'বাগে' পাইয়াছি ছাড়িয়া দিব কেন, যতটা পারি উস্থল করিয়া লই। হাকিমকে সকলেই তো খোশামোদ করে, কোন হাকিম তো খোশামোদ লইতে আপত্তি করে না। তুমিই বা এই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করিতেছ কেন।

অধিকলাল চিরকালই স্বল্পবাক। সমুন্দরির ভাষায় 'ভিতর-গুম্‌মা'। সে চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সে চাপরাসীকে আদেশ দিল ওই তরমুজ, চিঁড়া প্রভৃতি যেন বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসিল কোথায় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। অধিকলালকে জিপে করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইল।... সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল সমুন্দরিও চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, আর সে এখানে আসিবে না ... ...।

বমাল সুদ্ধ রামগোবিন ধরা পড়িয়াছে। এ অঞ্চলে সম্প্রতি খুব ডাকাতি হইতেছিল। কাজিগ্রামে এক জমিদারের বাড়িতে দুইটি খুন হইয়াছে, গহনাপত্র এবং নগদ টাকাতে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকার জিনিস লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে ডাকাতেরা। সেই সব জিনিস পাওয়া গিয়াছে রামগোবিনের গুদামে। এমন আরও অনেক জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহে চোরাই মাল। পুলিস সন্দেহ করিতেছে এ অঞ্চলে যত চুরি হয় তাহা রামগোবিনের সহায়তাতেই হয়, চোরাই মালগুলি সেই রাখে, সুবিধা মতো বিক্রয় করে এবং চোর-ডাকাতরা তাহার বখরা লয়। রামগোবিনকে হাতকড়ি দিয়া গ্রেফতার করিয়া আনিয়াছেন এস-পি যোগীন্দর সিং। তাহাকে জামিনে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে।

যোগীন্দর সিং করিৎকর্মা লোক। তিনি আসিয়া অধিকলালকে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "রামগোবিন শাঁসালো মাল। একটু চাপ দিলেই হাজার কয়েক টাকা গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

যোগীন্দর সিং একথা অবশ্য বলিলেন না যে টাকাটা আমরা দুজনে অনায়াসে ভাগ করিয়া লইব। কিন্তু তাঁহার ভাব-ভঙ্গী হইতে সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল,

উহাকে জামিন দিব না। কয়েকদিন পরে অধিকলালের কোর্টেই উহার বিচার হইল। বিচারের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় রামগোবিনের 'মুনিম্‌জি' (manager) অধিকলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। একটি খাম তাহার হাতে দিয়া বলিল—মালিক বলিয়াছেন এটা আপনাকে ফিরাইয়া দিতে। অধিকলাল খাম খুলিয়া দেখিল—এটা সেই হ্যাণ্ডনোটটা যাহাতে সে ছাত্রজীবনে সই করিয়াছিল। অধিকলাল বলিল—"এটা ফেরত নেব কেন? টাকা দিয়ে তবে নেব।"

"মালিক বলেছেন ও টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না"

"তোমার মালিকের দান আমি নেব কেন? এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে—"

মুনিমজি হ্যাণ্ডনোটটি লইয়া ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। বিচারে রামগোবিনকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া অধিকলাল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। রামগোবিন তাহার বাবার বন্ধু ছিল, ছেলেবেলার নানা ছবি মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য আইনের অমোঘ নিয়মকে সে কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে বিচারকের আসনে বসিয়া।

......মাস ছয়েক পরেই কিন্তু রামগোবিন ছাড়া পাইয়া গেল। সে আপীল করিয়াছিল। আপীলে নাকি অধিকলালের রায় টেকে নাই। আর একটা খবরও অধিকলালের কানে আসিল। এস-পি যোগীন্দর সিং এবং একজন এস-ডি-ও নাকি রামগোবিনের জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক তদ্বির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত দিয়াই নাকি রামগোবিন প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। রামগোবিন ছাড়া পাইবার কিছুদিন পরেই অধিকলাল একটি উকিলের চিঠি পাইল।

রামগোবিন লিখিয়াছে এক মাসের মধ্যে হ্যাণ্ডনোটের টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে। অধিকলাল গভর্ণমেণ্ট প্লীডারকে চিঠিটি

দেখাইল। তিনি সব শুনিয়া যে উত্তর লিখিয়া দিলেন তাহার মর্ম এই যে আমার মক্কেল অধিকলাল মণ্ডল, যখন ওই হ্যাণ্ডনোটে সই করিয়াছিল তখন সে নাবালক। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়াছিল মাত্র। সুতরাং আইনের চক্ষে তাহাকে এজন্য দায়ী করা যাইবে না। ঋণটা স্বর্গীয় রংলাল করিয়াছিল এবং তাহার বিষয় হইতেই এ ঋণ উসুল করা উচিত।...কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাশ্রুনয়নে রামগোবিন আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া বলিল—বাবুজি, আমি ওই টাকার জন্য তোমার নামে কি মকোর্দমা করিতে পারি? আমার মুনিমজি আমাকে না জানাইয়া উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া ওই চিঠি তোমাকে পাঠাইয়াছে। আমি আজ হঠাৎ টের পাইলাম। ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া। অধিকলাল তাহাকে যে জেলে পাঠাইয়াছিল এবং টাকার জোরে সে যে আবার জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এ কথার উল্লেখমাত্র সে করিল না। অধিকলাল বলিল—আমার হাতে টাকা নাই এখন। পরে আমি বাবার ঋণ শোধ করিয়া দিব। কিংবা বাবার যে পাঁচ বিঘা জমি আছে শুনিয়াছি, সেটা আপনি বিক্রয় করিয়া আপনার ধার শোধ করিয়া লইতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাতে। রামগোবিন বলিল—সে জমিতে সমুন্দরি গিয়া বাস করিতেছে। রণছোড়ও সেখানে জুটিয়াছে। সে জমির ত্রিসীমানায় যাইবার সাধ্য আমার নাই.......। জেনানীর সহিত কাজিয়া (ঝগড়া) লড়াই করিয়া...... ।

এস-পি যোগীন্দর সিংকে লইয়া অধিকলাল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরা অবিবাহিত, সুরূপ অসমসাহসী এবং নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত। বড়লোকের ছেলে। নিজের একটা ভালো মোটরকার আছে। সেটাকে লইয়া সর্বত্র দাবড়াইয়া বেড়ায়। উচ্চপদস্থ

অফিসার, সুসতরাং সে প্রায় অপ্রতিহতগতি। লোকে তাহার নানাবিধ কুকীর্তি সম্বন্ধে উদাসীন নহে, তবুও তাহাকে সকলে সেলাম করে। অধিকলাল পপুলার নহে, কিন্তু যোগীন্দর সিং পপুলার। এই যোগীন্দর সিং অধিকলালের বাড়িতে যখন তখন আসিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় অধিকলালের অনুপস্থিতিতেও। ফুলেশ্বরী একমুখ হাসিয়া তাহাকে সম্বর্ধনা করিত। কারণও ছিল ইহার। অধিকলাল সরকারী কাজ ছাড়া আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিত না। ফুলেশ্বরীর ইচ্ছা গাড়ী লইয়া বাজারে বাজারে ঘোরে, সিনেমায় যায়, অন্যান্য অফিসারদের বাড়িতে গিয়া আত্মআস্ফালন করে। কিন্তু অধিকলাল আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিতে দেয় না। বলে—যাইতে চাও রিকশায় যাও। ফুলেশ্বরী উত্তর দেয়—কালেকটার সাহেবের বউ আমি রিকশায় যাইব কি। আমার কি মানসম্ভ্রম নাই? অধিকলাল কোনও উত্তর দেয় না। কিন্তু গাড়িও দেয় না। সিনেমা হাউসের মালিকরা 'পাস' পাঠায়, কিন্তু অধিকলাল সে 'পাস' ব্যবহার করে না। বলে—যদি সিনেমা দেখিতে চাও পয়সা খরচ করিয়া যাও। এইরকম যখন অবস্থা তখন যোগীন্দর সিং রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন তাঁহার সদ্য-কেনা চকচকে মোটরখানা লইয়া। ফুলেশ্বরীকে একদিন আড়ালে বলিলেন, আমাদের কালেক্টার সাহেব একটু ছিট্‌গ্রস্ত লোক, অনেস্টির (honesty) বাতিক তাঁহাকে 'বাউরা'র (পাগলের) পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। যাই হোক, আপনি কিছু ভাবিবেন না। আমার মোটর আপনি যখনই চাহিবেন পাঠাইয়া দিব। আমার আপিসে 'ফোন' করিলেই হইবে। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর লইয়া ফুলেশ্বরী রোজই প্রায় বাহির হইয়া যাইত। অধিকলাল বাধা দিত না কারণ সে অনুভব করিত বাধা দিলে যে সংঘর্ষ আনিবার্য হইয়া উঠিবে তাহাতে তাহার সংসারই পুড়িয়া যাইবে হয়তো। সে আশা করিয়া রহিল একদিন ফুলেশ্বরীর আত্মসম্মানবোধ স্বতঃই জাগরিত

হইয়া উঠিবে তখন সে নিজেই সামলাইয়া লইবে নিজেকে। একদিন কিন্তু বাধা দিতেই হইল। কয়েকটি দোকান হইতে 'বিল' (Bill) লইয়া জনকয়েক দোকানদার একদিন সসঙ্কোচে অধিকলালের সহিত দেখা করিলেন। সকলেই প্রায় এক কথাই বলিলেন। কোনও দোকান হইতে মেমসাহেব কিছু শাড়ি ধারে লইয়া আসিয়াছেন, কোন দোকান হইতে এসেন্স, পমেড জাতীয় প্রসাধন দ্রব্য, একটা দোকান হইতে ঝুটা-পাথর-বসানো একটা গিল্টির হার। অধিকলাল প্রশ্ন করিল, আপনাদের কোনও ক্রেডিট্ মেমোতে কি উনি সই করিয়া লইয়া আসিয়াছেন? সকলেই বলিল, না, তাহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, দাম পাঠাইয়া দিব। কিন্তু এখনও পাঠাইয়া দেন নাই। হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন। এখনই টাকাটা দিবার দরকার নাই পরে কোনও সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমরা শুধু—।

অধিকলাল তাহাদের থামাইয়া দিল। হিসাব করিয়া দেখিল দেড়শ' টাকার বিল। হাতে টাকা ছিল, তখনই সব শোধ করিয়া দিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাদের বলিয়া দেয়—আর ধারে কোনও জিনিসপত্র মেমসাহেবকে দিও না। কিন্তু একথা সে বলিতে পারিল না। তাহার আত্মসম্মানে বাধিল। ফুলেশ্বরীকে গিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি বাজার হইতে এইসব জিনিস ধারে কিনিয়া আনিয়াছ?"

"হ্যাঁ"

"কেন?"

"আমার হাতে নগদ পয়সা ছিল না, তুমি তো নগদ পয়সা কিছু দাও না, সুতরাং ধার করিয়াই কিনিতে হইয়াছে।"

"ধার করিয়া আর কিছু কিনিও না। কিনিলে শোধ করিতে পারিব না। আমার মাহিনার অর্ধেক আমি জমা করিতেছি আমাদের

ঋণ শোধ করিবার জন্য। সেজন্য কিছুকাল কষ্ট করিয়াই থাকিতে হইবে”

“ওই জন্যই কি দিনে কেবল ছাতু খাইয়া থাক ?”

“ছাতু সস্তা, ছাতুর জন্য ডাল তরকারি প্রয়োজন নাই। তাছাড়া ছাতু আমার ভালোও লাগে। আর একটা কথা। তুমি যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে চড়িয়া বেড়াও কেন ?”

“যোগীন্দর সিং আমাদের বন্ধুলোক। চড়িলে ক্ষতি কি”

“ক্ষতি কি তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।”

[উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সম্ভবতঃ হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। অধিকলালের মুখেই এগুলি যোগেন শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই সে শুদ্ধ ভাষায় ব্যবহার করিয়াছে। মাঝে মাঝে এরূপ শুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন আরও আছে]

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল ফুলেশ্বরী ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর রোজ আসিত, ফুলেশ্বরী সাজিয়া গুজিয়া রোজ বাহির হইয়া যাইত। একদিন হঠাৎ অধিকলালের নজরে পড়িল একটা দামী শাড়ী পরিয়া ফুলেশ্বরী বাহির হইয়া যাইতেছে।

“আবার শাড়ি কিনিলে না কি ?”

“কিনি নাই। এ শাড়িটা আমাকে উপহার দিয়াছে—”

ইহার পর অধিকলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সহসা তাহার মনে হইল ফুলেশ্বরী এখনও মা হইতে পারে নাই। তাহার জননীত্ব লাভের আশাও নাই। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহার ইনফ্যানটাইল ইউটেরাস্ (infantile uterus)—সন্তান লাভ করিলে হয়তো তাহার চরিত্রে পরিবর্তন আসিত। সন্তানের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাও আছে। চাপরাসীর

ছোট ছেলেটাকে লইয়া প্রায়ই সে আদর করে। সহসা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তাহার মনে পড়িল—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ফুলেশ্বরীর মনেও ইচ্ছা আছে। কিন্তু হায় তাহা পূর্ণ হইবে না। তাই সে যখন শাড়িতে জরির ঝলক বিচ্ছুরিত করিয়া গটগট করিয়া যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে গিয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা হইল অধিকলালের। রাগ হইল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটাই তাহার মনের মধ্যে গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল—এ দুর্বলতা তো ভাল নয়। শাসন করা দরকার। আবার রবীন্দ্রনাথই তাহার কানে কানে বলিলেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

কিন্তু তবু সে ফুলেশ্বরীকে শাসন করিতে পারিল না। ফুলেশ্বরীকে সত্যই সে ভালবাসিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ মেয়েটার একদিন মোহ-ভঙ্গ হইবে, সে নিজেই একদিন 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মতো তাহার কাছে অনুতপ্তচিত্তে ফিরিয়া আসিবে এই আশাই সে মনে মনে করিতে লাগিল। মুখে কিছুই বলিল না, মুখে সে কোনদিনই কিছু

বলিতে পারে না, সে প্রাণপণে কেবল নিজের আদর্শটাকেই আঁকড়াইয়া রহিল.........

সামান্য একটা কেরানী নিয়োগের ব্যাপারে যে এতটা অপমানিত হইতে হইবে অধিকলাল তাহা কল্পনা করে নাই। রাজপুত ভুঁইহার, কায়স্থ, মৈথীল, মুসলমান, বাঙালী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রার্থী ছিল। হরিজনও ছিল দুইজন। অধিকলাল নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মার্কশীট দেখিয়া এবং ইণ্টারভিউ লইয়া বাঙালী প্রার্থীটিকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাহারই নাম উপরে 'রেকমেণ্ড' করিয়া পাঠাইল সে। উপরওলা মিনিস্টারই নিয়োগ করিবার মালিক। অধিকলাল যাহাকে রেকমেণ্ড করিয়া পাঠাইয়াছিল মিনিস্টার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন না। নিযুক্ত করিলেন একজন জাতভাইকে। অধিকলাল ছাড়িল না, খোঁজ করিল কেন উপযুক্ত প্রার্থীকে চাকুরি দেওয়া হইল না। খবর পাইল বাঙালী ছোকরাটির সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্ট নাকি ভালো নয়। আর একটা খবরও পাইল সে। যে লোকটি চাকরি পাইয়াছে সে নাকি হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছে। কাহার হাতে দিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইল না। বাঙালী ছোকরাটি প্রথম শ্রেণীর এম-এ। সে বিবর্ণমুখে একদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—'কি করব সার। আমি গরীব, ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। থাকলেও দিতাম না, অন্ প্রিন্সপল্ দিতাম না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এখন কি করি। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টেও যদি সুবিচার না হয়, তাহলে বাঁচব কি ক'রে আমরা'।

অধিকলাল তাহার কথার জবাব দিতে পারিল না। সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার......

আজবলাল একটি গুণ্ডায় পরিণত হইয়াছে। তাহার দাদা ম্যাজিস্ট্রেট এই হুমকি দেখাইয়া সে নাকি অনেক লোকের কাছে অনেক অন্যায় সুবিধা আদায় করিতেছে। তাহার দলে ও-অঞ্চলের যত 'লোফার' এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোক জুটিয়াছে। আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাতে আজবলালের সুবিধা হইয়া গিয়াছে। রামগোবিনের একমাত্র পুত্র যোগীনাথ এক পতিতার বাড়িতে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিছুদিন পূর্বে। রামগোবিনের আর পুত্র হয় নাই। সবই কন্যা। আজবলালই নাকি যোগীনাথের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়াছে আজকাল। রামগোবিনের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছে সে। আজবলালের একটা সুনামও হইয়াছে ও অঞ্চলে। সে গুণ্ডা বটে কিন্তু 'রবিন্‌হুড' জাতীয় গুণ্ডা। বড়লোকের ধনসম্পত্তি সে লুট করে কিন্তু লুটের টাকা নিজে সবটা আত্মসাৎ করে না। গরীবদেরও দান করে। এজন্য সে ও অঞ্চলে খুব 'পপুলার' হইয়াছে। মদ খায়, চরিত্রহীন, তবু পপুলার, কারণ গরীবদের সে 'মা বাপ'। ও অঞ্চলে সে নাকি একটা ডাকাতের দলই গঠন করিয়াছে। তাহারা ডাকাতি করিয়া যাহা কিছু রোজগার করে তাহার কিছুটা আজবলাল গরীবদের দেয়, বাকিটা দেয় রামগোবিনকে। আজবলালের চর অনুচরদের সহায়তায় সে সব চোরাই মাল রামগোবিন নাকি বড় বড় শহরে পাচার করিয়া দেয়। সে আর নিজের গুদামে চোরাই মাল রাখিতে সাহস করে না। একটা রাজনৈতিক দলেও নাকি আজবলাল পাণ্ডা হইয়াছে। রামগোবিনকে সে বুঝাইয়াছে আজকাল রাজনীতির যুগ, টাকা খরচ করিয়া একটা রাজনৈতিক দলকে যদি নিজেদের হাতে রাখা যায় তাহা হইলে সুবিধা হইবে। রামগোবিনও সেটা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই টাকা খরচ করিতে সে আপত্তি করিতেছে না। ভ্রাম্যমাণ একজন মিনিস্টারকে সে নাকি খুব খাতির করিয়া ভোজ খাওয়াইাছে, দশ সের খাঁটি ঘৃতও নাকি

উপহারস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরির সহিত আজবলালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে নাকি একদিন মদ খাইয়া বাড়িতে মাতলামি করিতেছিল, সমুন্দরি তাহাকে 'ঝাড়ু' মারিয়া বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। অধিকলাল আজবলালকে চিঠি লিখিয়াছিল, তুমি সৎপথে থাকিয়া ভদ্র জীবন যাপন কর। আবার যদি পড়িতে চাও পড়, আমি তোমাকে টাকা পাঠাইব। আজবলাল এ চিঠির জবাব দেয় নাই, নিজের স্বভাবও বদলায় নাই।......

আর একটি নিদারুণ সংবাদ বিচলিত করিয়াছে অধিকলালকে। সমুন্দরি নাকি রণছোড়কে চুমানা করিয়াছে। কেন করিয়াছে তাহার জবাব সমুন্দরি নিজেই দিয়াছে তাহার গোতিয়াদের (কুটুম্বদের) বলিয়াছে, লোকেদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এ কাজ করিয়াছে সে। তাহাকে গতর খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। অতি ভোরে উঠিয়া সে ঢেঁকি কোটে। তাহার পর প্রায় মাইল দুই দূরে নিজের জমিতে গিয়া কাজ করে। তাহার পর ফিরিয়া আসে আবার বাজারে। সেখানে গোলায় আসিয়া 'দানা' (শস্য) ফাটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হয়। সন্ধ্যার সময় তাহার পা দুইটা খুব ব্যথা করে। 'পুতহু' (পুত্রবধূ) বা মেয়ে কাছে থাকিলে তাহাদের কাহাকে দিয়া সে পায়ে একটু গরম তেল লাগাইয়া পা টিপাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহার কেহ তো কাছে নাই। নিজেই সে নিজের পায়ে তেল লাগাইয়া টিপিত। একদিন রণছোড় বলিল—আমি যদি টিপিয়া দিই তুমি আপত্তি করিবে কি।

ইহাতে সে আপত্তি করে নাই। কিন্তু সে 'কিরিয়া' খাইয়া (দিব্যি গালিয়া) এ কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে তাহার মনে কোন পাপ ছিল না। রণছোড়ের মনেও ছিল না। তাহার কোনও বদচাল সে কোনদিন দেখে নাই। সে প্রত্যহ নিজের আংনার

(উঠানে) হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া বসিত, রণছোড় তেল গরম করিয়া তাহার পা মলিয়া (টিপিয়া) দিত। এই সামান্য ঘটনাতেই অনেকের রসনা 'ছন্‌ছন্‌' (চনমন) করিয়া উঠিল। সকলে নানা রকম কুৎসা রটাইতে শুরু করিল। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই রণছোড়কে সে 'চুমানা' করিয়াছে। করিবেই বা না কেন ? ছেলে মেয়ে কেউ তাহার কাছে থাকে না, তাহাকে কাছে লইয়া যাইবারও উৎসাহ বা আগ্রহ কাহারও নাই। আজবলাল বিবাহ করে নাই, সে দারু (মদ) খাইয়া রান্‌ডির (বেশ্যার) বাড়িতে পড়িয়া থাকে। তাহাকে দেখিবে কে ? স্ত্রীলোকমাত্রেরই কি উচিত নয় একজন শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষের আশ্রয়ে থাকা ? তাহার ভয়ও করে মাঝে মাঝে। এখানকার নূতন দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি সে দেখিয়াছে, লোকটা প্রৌঢ়, তাহার বাড়ির চারিদিকে সে মাঝে মাঝে আসিয়া ঘোরা-ফেরা করে। তাহার চাল-চলন ভালো লাগে না সমুন্দরির। এই সব কারণে সমুন্দরি চুমানা করিয়াছে। তাহার খুশি হইয়াছে তাই করিয়াছে, সে কি কাহারও খায়, না, কাহারো পরোয়া করে।...

সমুন্দরির বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি জাগাইবার ঐশ্বর্য তাহার দেহে তখনও ছিল।

অধিকলাল সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। বলিবেই বা কি ? চুমানা করা তো বে-আইনী কাজ নয়। হঠাৎ তাহার মনে হইল এত লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ হইয়াছে! কাহার কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিয়াছে সে। তাহার চাপরাসী লাট্টু, লেখাপড়া শেখে নাই। সে তাহার মা বউ ছেলে মেয়ে লইয়া সুখেই আছে। তাহারই কম্পাউণ্ডে থাকে তাহারা। তাহাদের মধ্যে আদর্শের বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সংঘাত নাই। উহারা নিখুঁত নয়, মূর্খ, উহাদের

অনেক দোষ আছে, কিন্তু উহারা সুখী। অন্ততঃ আমার চেয়ে সুখী।

... ...

অধিকলাল যেন ঘরে-বাহিরে মার খাইতে লাগিল। একদিন দেখিল একটি মরা ছেলে লইয়া একদল লোক তাহার বাংলোর সামনে বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপার? একটি লোক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—হুজুর, আমার ছেলে। হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলাম, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। হাসপাতালের নার্স ঔষধের একটি ফর্দ লিখিয়া দিয়াছিল কেবল। বাজারে গিয়া দেখিলাম সে ঔষধের মূল্য কুড়ি টাকা। আমার কিনিবার সামর্থ্য নাই। হাসপাতালে একফোঁটা ঔষধ দেয় নাই ছেলেটাকে। যখন ইংরেজ বাহাদুর এদেশে ছিল তখন হাসপাতালে বিনা পয়সায় দাবাই (ঔষধ) মিলিত, বিনা পয়সায় রোগীকে পথ্য দেওয়া হইত। এখন সে সব কিছুই নাই। এখন নগদ 'রূপিয়া' (টাকা) না ফেলিলে ডাক্তাবাবুরা 'নবজ্' (নাড়ী) পর্যন্ত দেখেন না। .... অধিকলাল অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিল ব্যাপারটা সত্যই। হাসপাতালে গরীব রোগীরা ঔষধপথ্য পায় না। হাসপাতাল কয়েকজন সরকারী ডাক্তার ও নার্সের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের শিকার-ক্ষেত্র হইয়াছে। উহা হাসপাতাল নয়, ফাঁদ। ওখানে গরীব অসহায় রোগীদের ফাঁদে ফেলিয়া শোষণ করা হয়, দোহন করা হয়। অধিকলাল এ বিষয়ে সিভিল সার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন সব রোগীকে বিনা মূল্যে ঔষধপথ্য দিবার মতো অর্থ হাসপাতালের তহবিলে নাই। অধিকলাল কিন্তু খবর পাইল যে হাসপাতাল হইতে বাহিরের কোন কোন দোকানদার ঔষধ কম মূল্যে কিনিয়া বেশী মূল্যে বিক্রয় করেন্। যে বড় ঔষধ বিক্রেতাটি প্রতি মাসে হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকেন, তিনি নাকি ঔষধই

পাঠান না, শুধু 'বিল' পাঠান এবং সে 'বিল' 'পাস' হইয়া যায়। হাসপাতালের খাতায় ঔষধগুলি মিথ্যা করিয়া জমা করা হয় এবং মিথ্যা করিয়াই খরচ দেখানো হয়। আসলে ঔষধ হাসপাতালে আসেই না। এইসব খবর সংগ্রহ করিয়া অধিকলাল উপরে একটি কন্‌ফিডেনশাল (confidential) রিপোর্ট পাঠাইল যাহাতে এইসব অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করা হয়। কিন্তু উপরের দপ্তর-অরণ্যে তাহা কোথায় যে হারাইয়া গেল তাহার সন্ধান অনেকদিন মিলিল না। খবরটা চাপা থাকে নাই। অধিকলালের অপিস হইতেই হাসপাতালের ডাক্তাররা এবং সিভিল সার্জন খবরটা পাইয়া গেলেন। তদ্বির করিবার জন্য উপরে লোক ছুটিল। ডাক্তারদের চটাইয়া অধিকলালই বিপদে পড়িয়া গেল। ফুলেশ্বরীর তলপেটে একদিন খুব ব্যথা। সিভিল সার্জনকে 'কল' দিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন একটা জরুরী অপারেশনে ব্যস্ত আছেন, এখন যাইতে পারিবেন না। হাসপাতালের একজন তরুণ অ্যাসিটেণ্ট সার্জন একটু পরে মুচকি হাসিতে হাসিতে আসিলেন এবং সব শুনিয়া বলিলেন—লেডি ডাক্তারকে দিয়া ভিতরটা একবার দেখান দরকার। লেডি ডাক্তারও জরুরী অপারেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে পারিলেন না। অধিকলাল শহরের একজন প্রাইভেট প্রাকটিশনারকে ডাকিয়া ফুলেশ্বরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। হাসপাতালের গরীব রোগীদের দুঃখ-দুর্দশা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারিল না। সে কেবল উপরে রিপোর্ট করিল—আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার নাই ... ...

...মিউনিসিপ্যালিটির একটি রাস্তাও মেরামত হয় নাই। সব রাস্তাই হাড় পাঁজরা-বাহির করা, চারিদিকে গর্ত, খানাখন্দ। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স পেয়াররা (tax payer) একদিন অধিকলালের

কাছে আসিয়া হাজির হইল এবং ইহার প্রতিকার করিতে বলিল। ফোন করিতেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সসম্ভ্রমে বলিলেন— আমি চেষ্টা করিতেছি। ফাণ্ডে তেমন টাকা নাই। অধিকলালের সহসা মনে হইল ফাণ্ডে টাকা নাই কেন। ট্যাক্স তো আদায় হইতেছে,—তবে? মনে পড়িল সিভিল সার্জনও বলিয়াছিলেন ঔষধ কিনিবার টাকা নাই। সেদিন এক মাড়োয়ারী পেট্রল-বিক্রেতা গভর্ণমেণ্টের মোটরগুলিতে ধারে তেল দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বলিয়াছে—নগদ দাম দিয়া তেল কিনিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টকে ধারে তেল দিলে সহজে তাঁহারা প্রাপ্য টাকা দেন না। অনেক দিনের অনেক ধার জমিয়া আছে। গভর্ণমেণ্টের হাতেও নগদ টাকা নাই। সেজন্য অনেক মোটর তৈলহীন অবস্থায় অচল পড়িয়া আছে। টাকা নাই কেন? এত টাকা যে আদায় হয়, এত টাকা যে বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া আনা হইতেছে—সে সব কোন বাবদে কোথায় খরচ হয়? কে খরচ করে? মন্ত্রীরা প্লেনে করিয়া উড়িয়া বেড়ান, হোমরাচোমরা অফিসাররা ক্রমাগত নানা 'মিশনে' বিদেশে যাইতেছেন, দেশের ওজন বাটখারা 'সের'কে 'কিলো'তে পরিবর্তন করিবার জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয়িতও হইতেছে, বিদেশ হইতে আগত অতিথিবৃন্দকে সমারোহে সম্বর্ধনা করিবার আগ্রহ আমাদের কিছুতেই যেন কমিতেছে না...অথচ দেশে চাল নাই গম নাই, চিনি নাই... শিক্ষা দিবার নামে কতকগুলো স্কুল কলেজ আছে বটে কিন্তু সেখানে শিক্ষা হয় না...শিক্ষকেরা পর্যাপ্ত বেতন পান না, ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল...... গ্রাম হইতে একজন 'বি, ডি, ও'র (B. D. O.) বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে তিনি নাকি 'দো-হাত্‌তা' ঘুষ লইতেছেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটি দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এ ধরনের দরখাস্ত প্রায় আসে কিন্তু আপিসে ধামাচাপা পড়িয়া থাকে। এবার কমিশনার সাহেব অধিকলালকে পাঠাইলেন ব্যাপারটা

সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য। তদন্ত করিয়া ঘুষের কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু একটি বিষয়ে অধিকলাল নিঃসন্দেহ হইল। সেকালের নায়কেরা যে দাপটে ও যে আরামে গ্রামে বাস করিতেন এই বি, ডি, ও,'-ও সেই দাপটে ও আরামে আছেন। গভর্ণমেণ্ট পুরাতন জমিদারি-প্রথা লোপ করিয়া নূতন ধরনের জমিদারি-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন।... ... ...

অধিকলাল দিন দিন ক্রমশঃ যেন বিমর্ষ হইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল সবই বৃথা, সবই বৃথা। এ শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে বটে কিন্তু একটি লোকও কি দেশকে আপন বলিয়া মনে করে? সবাই তো নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মত্ত। ট্রেনের কামরা হইতে আয়না, গদি প্রত্যহই চুরি যাইতেছে। ইলেকট্রিক তার প্রায়ই অন্তর্ধান করিতেছে। বড় বড় অফিসাররাও ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন না। সকলেই নিজের কোলের দিকে ঝোল ঢালিতে ব্যস্ত—দেশের কথা কেহ কি ভাবে? কেহ কি অনুভব করে? বক্তৃতায় যাহা বলে কাজে তো তাহা করে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িয়া গেল তাহার—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
... ...
ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।
... ...

ফুলেশ্বরী এখনও বদলায় নাই। অধিকলাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে ... ...

...সেদিন অধিকলাল টুর হইতে ফিরিতেছিল। ট্রেনে একটি মাত্র ফার্স্ট ক্লাস 'বগী' ছিল। কিন্তু সেটিও পরিপূর্ণ। অধিকলালের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাহার চাপরাসী ও ক্লার্ক অন্য কামরায় চড়িয়াছিল। সুতরাং সে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাহা কেহ চিনিতে পারিল না। অধিকলাল চিরকালই অন্নপ্রচারবিমুখ, সুতরাং সে সসঙ্কোচেই ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই একজন টিকিট কালেকটার আসিল এবং গাড়িতে উঁকি দিয়াই চলিয়া গেল। কাহারও কাছে টিকিট চাহিল না। অধিকলাল প্ল্যাটফর্মে নামিয়া তাহাকে নিজের টিকিট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি অন্য প্যাসেঞ্জারদের টিকিট চাহিলেন না কেন?"

"উহারা সব স্কুল-কলেজের ছেলে। সব উইদাউট টিকিটে যাতায়াত করে।"

"আপনারা টিকিট চানও না?"

"না। চাহিতে গেলে উহারা আমার প্রাণসংশয় করিবে।"

"পুলিস নাই?"

"পুলিস কিছু বলিবে না। তাহারা দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে কেবল।"

টিকিট কালেকটার হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অধিকলাল গিয়া ট্রেনে চড়িল। বসিবার জায়গা পাইল না, একধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের স্টেশনে নামিয়া গেল অনেক ছেলে। জন দুই মাত্র রহিল। তাহারাও ছাত্র। আরও দুই স্টেশন পরে নামিবে। অধিকলাল তাহাদের পাশেই বসিল এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। হিন্দীতেই আলাপ হইল।

"আপনারাও ছাত্র ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ করিবেন না তো ?"

"না, না, কি বলুন—"

আপনারা সব নাকি উইদাউট টিকিটে যান—"

ছাত্রটি আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিল—"যাই !" দ্বিতীয় ছাত্রটি একটু রুখিয়া বলিয়া উঠিল—"যাইব না কেন ? সবাই তো লুটেরা (ডাকাত), কোন নায্য ব্যাপারটা হয় বলুন। বাজারে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, কালোবাজারীরা সেখানে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছে, আমাদের কলেজে প্রতি মাসে বেতন লওয়া হয়, কিন্তু পড়ানো হয় না, মাস্টাররা ঘুষ খাইয়া খারাপ ছেলেকে ভালো নম্বর দেন, ভালো ছেলেরা পাত্তা পায় না, এ বাজারে যাহার টাকা, যাহার লাঠির জোর তাহারই জয়জয়কার। দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া এ স্বাধীনতা লইবার কি দরকার ছিল ? কি লাভ হইয়াছে ? উদ্বাস্তুতে দেশ ছাইয়া গেল। পাকিস্তানের কাছে আমরা শান্তির জন্য সর্বদা হাত-জোড় করিয়া আছি—কি লাভ হইয়াছে এ স্বাধীনতায় ? সবাই লুটেরা হইয়া গিয়াছে, আমরাও হইয়াছি—"

"আরে ভাই, ছাড়ো ওসব কথা। আপনি কি করেন সাহেব ?"

"আমি সরকারী চাকরি করি। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার খুব কষ্ট হয়। বিশেষতঃ ছাত্রদের এইসব বিক্ষোভ, আন্দোলন, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আমি বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ি। আপনারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—"

"ভাবিবেন না। আমরাই আবার দেশকে ঠিক করিয়া তুলিব। আগে আবর্জনা পরিষ্কার করা দরকার। বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে যাহারা বোমা পিস্তল বন্দুক লইয়া অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে

স্বাধীনতার অভিযান চালাইয়াছিল, তখন তাহাদেরও অনেকে ডাকু, গুণ্ডা, খুনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, তাজা 'খুন' বহাইয়া দিয়াছিলেন, আজ আমরা বুঝিতেছি তাঁহারা মহৎ শহীদ ছিলেন, ডাকু বা খুনী ছিলেন না—"

দ্বিতীয় ছাত্রটি বলিলেন—"কে জানে হয়তো তাহারাই আবার এ যুগে জন্মিয়াছে, এই ভুয়ো-স্বাধীনতার মিথ্যা মুখোশটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য আবার তাহারাই হয়তো প্রাণপণ করিতেছে। এ যুগের ছাত্রদের অত ছোট করিয়া দেখিবেন না, তাহারাও আদর্শবাদী। তাহারা কিন্তু কোথাও আদর্শের স্বরূপ দেখিতে পাইতেছে না। কোথাও কোনও আশা নাই, সব অন্ধকার। ঘরে, বাহিরে, স্কুলে, কলেজে, হাটে বাজারে, ইলেকশনে, শাসন পরিষদে, এমন কি সাহিত্যিকদের লেখাতেও তাহারা আশা বা আদর্শের আলো পাইতেছে না। তাই তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা 'ভুখা', তাহারা পিপাসিত। ছাত্রদের মধ্যে সবাই যে ভালো তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চই বলিব সকলে খারাপও নয়— অনেক ভালো আছে—" এই ধরনের অনেক কথা হইল। ছাত্র দুইটি নামিয়া গেল। অধিকলাল ... ...

টুরে বাহির হইয়া নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করে সে। একবার স্টেশনের একটা ওয়েটিংরুমে পরবর্তী ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, একটি ভিখারী আসিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা, চুল রুক্ষ, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুইটা কিন্তু অদ্ভুত। শানিত ব্যঙ্গ দৃষ্টি চকমক করিতেছে চোখের দৃষ্টিতে। অধিকলাল প্রথমে ভাবিয়াছিল সাধারণ মূর্খ ভিখারী বুঝি। কিন্তু কথা কহিয়া বুঝিল লোকটি সাধারণ তো নহেই, মূর্খও নহে, যদিও সে নিজের পরিচয় কিছুতেই দিল না। লোকটি বাঙালী, বাংলাতেই কথা হইল।

"ভিক্ষে চাইছ কেন ? লজ্জা করে না ?"

"লজ্জা কিসের ? এ দেশের সব বড় বড় লোকই তো ভিক্ষুক। বুদ্ধদেব ভিক্ষা করতেন না ? আমাদের গভর্ণমেণ্টই তো ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! দুচারটে লোক ছাড়া এদেশের সমস্ত লোকই তো হয় ভিখারী, না হয় চোর, না হয় ভিখারী প্লাস চোর। আমি শুধু ভিখারী, আমাকে কিছু দিন দয়া করে, দুদিন খাইনি—"

"তুমি নিজেকে ভিখারী মনে করছ কেন ? তুমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক একজন—"

লোকটি হাসিমুখে অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"স্বাধীনতা ?" বলিয়া চটাস্ করিয়া একটা তুড়ি দিয়া আবার চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"ম্যাজিকের মতো এলো আবার উড়ে গেল। কিছু দেবেন তো দিন, আর না দেন তো আর কারো কাছে যাই—"

"দিচ্ছি তোমাকে কিছু। কিন্তু পরিশ্রম করে' রোজকার করাই উচিত—"

"ভিক্ষে করতেও তো পরিশ্রম করতে হয় মশাই। সারাদিন টো টো করে' হাঁটছি, এতে পরিশ্রম হয় না ভেবেছেন ? পরিশ্রম করে' অনেক পরীক্ষা পাস করেছিলাম, কিছু লাভ হয় নি, ভিক্ষে করে' বরং কিছু কিছু পাই রোজ—"

আট আনা পয়সা পাইয়া লোকটি হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

"আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন ?"

"সে সব কথা থাক—"

হঠাৎ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

... ...

"তুমি যে রোজ এমন সেজেগুজে যোগীন্দরের সঙ্গে বেরোও এতে তোমার লজ্জা হয় না ?"

"লজ্জা কিসের ? আমি কালেকটার সাহেবের বউ, আমার আবার লজ্জা কি। সবাই তো আমাকে খাতিরই করে দেখি। সাজগোজ না করিয়া গেলেই বরং বেমানান হইত। যে সমাজে আমরা মিশি, সেখানে কেহই 'ন্যাংটা' নয়—"

"কিন্তু চাকর-বাকররা তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে ? তাহারা চাকর হইলেও সব বুঝিতে পারে।"

"তাহারা কি মনে করে না করে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাইতে চাই না।"

"উহাদের চোখের দৃষ্টি যাহা বলে তাহা অত্যন্ত অসম্মানজনক। উহারা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিয়া বাহিরে সেলাম করে, কিন্তু আসলে উহাদের চোখে আমি একটি 'বুদ্ধু' মাত্র। তোমার চালচলন মোটেই ভদ্র নয়।"

সাপের মতো ফোঁস করিয়া উঠিল ফুলেশ্বরী।

"আমার চালচলন ঠিকই আছে। তাহা লইয়া তোমারা মাথা না ঘামাইলেই ভালো হয়।"

নখুও ভালো চাকরি পাইয়াছে। সে আই, এ, এস হইতে পারে নাই। বি, সি, এস পরীক্ষাটা ভালো ভাবে পাস করিয়াছে। কিছুদিন চাকরি করিবার পর অধিকলালকে সে যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহা এই ঃ

খুদরু দা,

আমাদের বাড়িটা তন্নু কিছুতে বিক্রয় করিতে দিল না। অগত্যা তাই আমরা একজন কেয়ারটেকার রাখিয়া দিয়াছি। পরে যাহা হয় করা যাইবে। তন্নুর ছেলের বয়স পাঁচ বৎসর হইল। তন্নু তাহার ছেলে ও স্বামীকে লইয়া আমাদের বাড়িতে গিয়াছিল। দিন দশেক

ছিল'ও। মা-ও বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছেন তাঁহারও ইচ্ছা নয় যে বাড়িটা অপরের হাতে চলিয়া যায়। বিশেষতঃ রামগোবিনের হাতে যাক মা এটা চান না। ওখানকার স্কুলের নূতন হেডমাস্টার শ্যামশঙ্করবাবুই বাড়িটিতে বাহিরের দিকে থাকেন। আমরা যে কেয়ারটেকার চাকরটি রাখিয়াছি, তাহারই সহায়তায় তিনি বাড়িটিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বাড়ির সামনের বাগানটি এখনও তেমনি চমৎকার আছে। শ্যামশঙ্করবাবুর বাড়ি দেওঘরের কাছে। তিনি চমৎকার কতকগুলি গোলাপ গাছ আনাইয়া নাকি লাগাইয়াছেন। আমি ছুটি পাই নাই বলিয়া যাইতে পারি নাই, তনু আমাকে অনেক করিয়া যাইতে লিখিয়াছিল। ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। যদি পাই তাহা হইলে যাইব এবার। তুমিও যদি আসিতে পার খুব আনন্দের হইবে। তনু লিখিয়াছে তুমি যদি আস সেও আবার আসিবে। তুমিও খুদরুদা ছুটির দরখাস্ত কর। তুমি আসিবে শুনিলে মাও হয়তো আবার আসিতে পারেন। একটি সুসংবাদ দিতেছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় তো তুমি আসিতে পারো নাই। ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় কিন্তু আসিতে হইবে। আমি চেষ্টা করিতেছি পূর্ণিয়াতেই বদলি হইবার জন্য। তুমি যদি তখন থাকো তোমার নিকটেই কিছু কাজ শিখিব। হ্যাঁ আর একটা কথা। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। চিঠিতে তাঁহার নামটা আর করিব না। তিনি বলিলেন—অধিকলাল কাজে কর্মে খুব ভালো। সে যদি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার দ্রুত উন্নতি হইত। কিন্তু তাহার মাথায় ছিট আছে—অনেস্টির (honesty) ছিট। এজন্য কাহারও সহিত সে মানাইয়া চলিতে পারে না। সকলকেই সে চটাইয়াছে। এমন কি জনৈক হোমরা-চোমরা অফিসারও নাকি নেহেরুজির কাছে গিয়াও তোমার

নামে নালিশ করিয়াছেন। নেহেরুজি সব শুনিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্রলোকটি। নেহেরুজি নাকি বলিয়াছেন—ওই রকম লোকই তো চাই। ওকে পাগলা বলিতেছেন কেন, হি ইজ অনেস্ট। এ খবর যদি সত্য হয় তাহা হইলে নেহেরুজি তোমাকে হয়তো দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারেন। তবে খুদরুদা—একটা কথা বলিব? রাগ করিবে না তো। যখন চাকরি করিতেই হইবে তখন ওপরওয়ালাদের চটাইয়া কোন লাভ নাই।......

একবার 'টুর' উপলক্ষেই অধিকলাল স্বগ্রামে গিয়াছিল। উঠিয়াছিল সরকারী ডাক্‌বাংলোয়। অনেকেই তাহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য আসিয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা পুরাতন কৃতী ছাত্র হিসাবে স্কুলে একটি বিশেষ অভিনন্দন-সভার আয়োজনও করিয়াছিলেন। সে সভায় কিন্তু সে যায় নাই। সে স্কুল ফাণ্ডে একশত টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিল। সমস্তদিন সরকারী ডাকবাংলোয় বসিয়া সরকারী কাজই করিল সে। যে রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা হিসাবে আজবলাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিল সেই রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ছোকরাকে লইয়া স্বয়ং রামগোবিন আসিয়া হাজির। তাহার 'আর্জি' অধিকলাল যদি উক্ত রাজনৈতিক দলের আপিসে গিয়া একবার পদার্পণ করে তাহা হইলে আজবলাল কৃতার্থ হইয়া যাইবে। সে 'লেহাজসে' (লজ্জায়) নিজে আসিতে পারে নাই। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল—সে এখানে সরকারী কাজে আসিয়াছে, সভা-সমিতি বা অন্য কোন স্থানে সে যাইবে না। তবু সে দুই জায়গায় গিয়াছিল। কাজ যখন শেষ হইল তখন সে গিয়াছিল তপনকান্তিবাবুর বাড়িটাতে। স্কুলের শিক্ষক শ্যামশঙ্করবাবু তখন ওখানে ছিলেন না। বাড়ির 'কোয়ারটেকার' চাকরটাকে লইয়াই সে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরিয়া দেখিল। যে লাইব্রেরি ঘরটায় বসিয়া সে পড়াশুনা করিত সেই লাইব্রেরির

বারান্দায় গিয়া খানিকক্ষণ বসিল। সেই গাছটা এখনও বাঁচিয়া আছে যে গাছে সে তনুর জন্য দোলনা টাঙাইয়া দিয়াছিল। সেই গাছটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। সেই সেকালের ছোট তনুই যেন তাহার আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল।......তাহার পর গেল সে তাহার মায়ের কাছে। গিয়া দেখিল মা বাড়িতে নাই, মাঠে গিয়াছে। রণছোড়ও গিয়াছে। কুঁড়ে ঘরটার দিকে চাহিয়া রহিল সে। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তাহার উপর বড় বড় তালপাতাও রহিয়াছে কয়েকটা। আশেপাশে কয়েকটা ছাগল চরিতেছে। অধিকলাল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাঠের দিকেই অগ্রসর হইল সে। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। গোধূলি আসন্ন। গরুর দল ধুলা উড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছে। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড একবোঝা ঘাস মাথায় করিয়া সমুন্দরি আসিতেছে। তাহার পিছনে রণছোড়। তাহার মাথাতেও একবোঝা ঘাস। অধিকলাল প্রথমে তাহার মাকে চিনিতেই পারে নাই। ঘাসের প্রকাণ্ড বোঝায় তাহার মুখটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার হনহন করিয়া চলার ধরন দেখিয়াই অধিকলাল চিনিতে পারিল মাকে।

"মা"—

দাঁড়াইয়া পড়িল সমুন্দরি। তাহার পর ধপাস্ করিয়া ঘাসের বোঝাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অধিকলাল দেখিল তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

"কে খুদরু ?"

"হ্যাঁ—"

অধিকলাল খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া মায়ের এই হাঁপানি দেখিল। রণছোড়ও পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"কে বাবুয়া—?" হাসিমুখে আগাইয়া আসিল সে। অধিকলাল

তখন বলিল—মা তুমি এই বয়সে এত কষ্ট কেন করিতেছ? তুমি আমার কাছে চল। তোমরা দুইজনেই চল।

সমুন্দরির চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিল—না, বেটা আমি মজুরণী। হাকিমের বাড়িতে আমি থাকিতে পারিব না। যে কয়দিন বাঁচিব 'দুখধান্দা' (দুঃখকষ্ট) করিয়া কাটাইয়া দিব। আমার তেমন দুঃখও নাই, কষ্টও নাই, গতর খাটাইয়া খাই, কাহারও দুয়ারে হাতও পাতি না, কাহারও তোয়াক্কাও করি না। আমি কোথাও যাইব না, যেমন আছি তেমনি থাকিব। আমি ভালই আছি।

তাহার পর সে বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লইয়া আবার হাঁটিতে লাগিল। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অধিকলাল। সহসা দেখিল সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিমদিগন্তলগ্ন একখণ্ড মেঘ যেন রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।... .....

তাহার প্রেসিডেন্সী কলেজের এক বন্ধু তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার খানিকটা টুকিয়া দিতেছি। এ ছেলেটি কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়াছিল। পসার এখনও জমে নাই বলিয়া মন দিয়াছিল রাজনীতির দিকে। অধিকলালকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করিত। সে লিখিয়াছে—

"তোমার মতো আদর্শবাদী গভর্ণমেন্টের চাকুরি করিতেছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বর্তমানে শাসনের নামে যাহা চলিতেছে তাহার সমর্থন কোনও আদর্শবাদী লোক করিতে পারিবে বলিয়া আমি মনে করি না। ডেমোক্র্যাসির (democracy) নামে এ এক অদ্ভুত ধরনের ডিক্‌টেটারশিপ্ (dictatorship)। টাকার dictatorship। টাকা থাকিলে সব হয় এদেশে। শুধু পকিস্তান হিন্দুস্থান নয়, আমাদের দেশ আরও বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি। প্রাদেশিকতা ও কম্যুনালিজমের বিষে আমরা জর্জরিত হইয়া আছি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরাজিকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্থানে হিন্দীকে বসাইবার চেষ্টা—হিন্দী ইম্পিরিয়ালিজ্‌মেরই নামান্তর একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছে। এ দেশের হোমরা-চোমরা বড়লোকরা কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ইংরাজি পড়াইতেছে। দেশে নূতন নূতন অনেক মার্কিন স্কুল স্থাপিত হইতেছে, যে সব স্কুলের বেতন গরীবদের নাগালের বাহিরে। যাহারা আরও বড়লোক তাহারা নিজেদের ছেলেদের বিলাতে পড়াইতেছে। অর্থাৎ বড়লোকের ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, গরীবের ছেলেরা হিন্দী পড়িয়া চিরকাল তাহাদের চাকর হইয়া থাকিবে—এই ধরনের একটা মতলবও যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে আমার কাছে। তুমি বিহারী এ বিষয়ে তোমার সত্য অভিমত কি জানিতে ইচ্ছা হয়। তোমার মত আমার নিকট মূল্যবান, কারণ তোমাকে আমি একজন পক্ষপাতহীন খাঁটি লোক বলিয়া মনে করি। সকলকেই যদি আইন করিয়া ইংরেজি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহার একটা মানে বুঝিতে পারি কিন্তু কতকগুলি লোক টাকার জোরে ইংরেজি শিখিবে আর বাকিরা শিখিতে পারিবে না এ ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিতে পারি না। আমরা ইংরেজদের পোষাক-পরিচ্ছদ খানা-পিনা কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের লোকসভা প্রভৃতিও উহাদেরই নকলে, আমাদের স্বাধীনতাও উহাদের দান—আমরা বহুভাবে উহাদের কাছে ঋণী, এমন কি হাত পাতিয়া অর্থ-সাহায্যও আমরা উহাদের নিকট লইতে দ্বিধা করিতেছি না। সবই লইতেছি কেবল উহাদের ভাষা ও সাহিত্য—যাহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য—তাহাকেই 'বয়কট্' করিব কেন—ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছি না। হিন্দীওয়ালারা নিজেদের

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশটাকে আবার সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে ঠেলিয়া দিবে না কি? ইংরেজ আসিবার পরই আমাদের উন্নতি হইয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? ইংরেজ আমাদের শোষণ করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে—সবই সত্য। কিন্তু তাহারাই আমাদের মানুষ করিয়া গিয়াছে তাহারাই যে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে একসূত্রে বাঁধিয়া অখণ্ডতা দান করিয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? কার্জন সাহেবের সবুট লাথিই আমাদের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়াছে। সেই লাথিই ঘুমন্ত বাঙালীকে জাগাইয়াছে। সেই জাগ্রত বাঙালী মনীষাই দেশে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনশঙ্খ বাজাইয়াছে এ সব তো ঐতিহাসিক সত্য ......বর্তমানের শাসনকর্তারা যেন এসব সত্যকে আমোলে আনিতে চান না। তাঁহারা কতকগুলি half truth সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের যে বিকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তুমি দেখিয়াছ কি? তাহা পড়িলে মনে হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধিজীর অহিংস দলই যেন একমাত্র সেনানী। বাংলাদেশের শহীদদের দেশের জন্য প্রাণ-বিসর্জন যেন হিংসাত্মক হীন প্রচেষ্টা...এইসব সত্যকে চাপা দিবার প্রয়াস উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের ম্লান করিবার এই সব হাস্যকর স্পর্ধা দেখিয়া...সম্মুখে নূতন 'ইলেকশন'....তুমি...।

[চিঠিখানা সব পড়িতে পারা যায় নাই]

ইহার উত্তরে অধিকলাল লিখিয়াছিল—

ভাই তোমার চিঠি পাইলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে একটি ছোট কবিতায় দিয়া গিয়াছেন। সেইটিই উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেছি।

হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই
কবি কহে তার গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরই পিছু পিছু।

...হ্যাঁ ইলেকশন আসন্ন। আগামী ইলেকশনে একটা হইচই হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। আমাকে অন্যত্র বদলি করিবে শুনিতেছি। ঠিকই লিখিয়াছ, আমি চাকুরি করি বলিয়া সব সময় বিবেক-নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারি না। তবু চেষ্টা করি। কিন্তু সে চেষ্টাও সব সময়ে ফলবতী হয় না। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই দুইটি অবশ্যকর্তব্য পালন করা ক্রমশঃই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। দেশের ভদ্রলোকেরা, ভালো লোকেরা সত্যই বিপন্ন এবং মুমূর্ষু। যে ধর্ম দেশকে সৎপথে চালিত করে সে ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত। সে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমূল পরিবর্তন দরকার। দরকার এক আদর্শবাদী নির্ভীক সমাজ যে সমাজের লোকরা সত্য-শিব-সুন্দরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। সেই সমাজ, আগামী যুগের সেই যুগন্ধরদের নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাতেই লাগিয়া পড়..............

......যেখানে অধিকলাল বদলী হইয়া গেল সেখানে ধূমে ধূলায় এবং উত্তাপে রাজনৈতিক গগন বেশ সমাচ্ছন্ন। যাঁহারা শাসন-বিভাগে মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন তাঁহাদের আসন নাকি টলমল। ইলেকশনের সময় খুব গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা।... আর একটা ব্যাপারও কাক-তালীয়বৎ ঘটিয়াছে। অধিকলালের সহিত যোগীন্দরও বদলী হইয়া আসিয়াছে। ফুলেশ্বরী ভারী খুশী হইয়াছে ইহাতে। অধিকলাল খুশী হয় নাই, কিন্তু অখুশী ভাবটা প্রকাশ করে নাই। প্রকাশ করাটা অশোভন তো বটেই, নিষ্ফলও। আর একটা অস্বস্তিজনক ব্যাপারের মধ্যে গভর্ণমেন্ট তাহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এজন্য একজন পূর্বপরিচিত এবং বন্ধু-স্থানীয় এস-পি আসাতে অধিকলাল একটু নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টাও করিতেছে। কারণ এসব ব্যাপারে পুলিসের আন্তরিক এবং অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে সম্পুর্ণ দায়িত্ব বহন করা শক্ত হইয়া উঠে। কেন্দ্রীয়

গভর্ণমেণ্ট তাহাকে পোলিং অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। দুইটি পরাক্রান্ত ব্যক্তি ভোটদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। তাহার মধ্যে একজন আবার মন্ত্রী—তাহার মনিব-স্থানীয়। তিনি নিজে অবশ্য তাহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুগত চরেরা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। বলিয়াছে এবার যদি অমুক বাবু পুনরায় নির্বাচিত হন তাহা হইলে আবার তিনি নিঃসন্দেহে মন্ত্রী হইবেন। যদি মন্ত্রী হ'ন তাহা হইলে অধিকলালের প্রভূত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ এই মন্ত্রী মহাশয় অধিকলালের প্রতিভা এবং সততায় মুগ্ধ। কিন্তু ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি জেতে তাহা হইলে অধিকলালের সমূহ বিপদ। অর্থাৎ...অধিকলাল সবই বুঝিল। মুখে বলিল—আমি যথাসাধ্য আমার কর্তব্য পালন করিব। দেখিব যাহাতে ভোটাররা ঠিকমতো নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। দেখিব যাহাতে ভোট-গণনার সময় কোনরূপ কারচুপি না হয়। ইহার বেশী আর কি করিতে পারি। মন্ত্রী মহাশয় অনুভব করিলেন এ ছোকরাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া বিপথে চালিত করা সম্ভব নয়। এ গোঁয়ার ছোকরার নিজের সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞান একেবারে নাই।...

.......যোগীন্দরজির মোটরে চড়িয়া এখানেও ফুলেশ্বরী ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা লইয়া অনেকে গোপনে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, অধিকলালকেও এই কুৎসার উত্তাপ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে ইহা লইয়া কখনও কোন উচ্চবাচ্য করে না, বরং মনে হয় সেও যেন যোগীন্দরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।...কিছুদিন হইতে যোগীন্দরজি ফুলেশ্বরীকে রিভলভার ছোঁড়া শিখাইতেছে। তাহাকে একটা ভালো রিভলভার উপহারও দিয়াছে। যোগীন্দরজি প্রায়ই বক্তৃতা দেয় যে প্রত্যেক ভারতীয় রমণীই বীরাঙ্গনা, সুযোগ পাইলে সকলেই সুভদ্রা, দ্রৌপদী, রানী দুর্গাবাঈ, পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ প্রীতি

ওয়াদ্দেদার হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক রমণীরই উচিত কোন না কোন একটা শস্ত্র-শিক্ষা করা। সুযোগ এবং সুবিধা যখন আছে তখন ফুলেশ্বরী রিভলভার ছোঁড়া শিখিবে না কেন? এই উপলক্ষে প্রায়ই তাহারা মাঠে চলিয়া যায় এবং সেখানে রিভলবার লইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করে......

ইলেকশনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। টেলিগ্রাম করিয়া অধিকলালকে অন্য জিলায় বদলি করা হইল। তাহার স্থানে আসিলেন একজন খয়ের খাঁ ধুরন্ধর অফিসার যিনি দিনকে রাত এবং 'হয়'কে 'নয়' করিতে ওস্তাদ। অধিকলাল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইল 'আমাকে এখান হইতে বদলি করা হইয়াছে, সুতরাং আমার উপর ইলেক্‌শনের যে ভার দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিরূপে চালাইব নির্দেশ দিবেন'। উপর হইতে হুকুম হইল, "তুমি কলেকটারশিপের চার্জটা দিয়া দাও নূতন লোককে, কিন্তু ইলেকশনের ব্যাপারটা তোমাকেই শেষ করিয়া আসিতে হইবে"।......

ভোট দেওয়া যখন শেষ হইয়া গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দিন সকাল হইতে ভোট-গণনা করিবার কথা, তাহাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকলালকে একজন গোপনে খবর দিয়া গেল যে সব বাক্সে ব্যালট পেপারগুলি আছে সেগুলি যদি সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি চুরি হইয়া যাইবে, তালা ভাঙ্গিয়া নূতন ব্যালট পেপার তাহার ভিতর পুরিয়া দিবে। অধিকলাল ঠিক করিল রাত্রেই সে সমস্ত ভোট গণনা শেষ করিয়া ফেলিবে। মিলিটারি পাহারার সাহায্য লইয়া চারিদিকে অনেক আলো জ্বালাইয়া। সে নিজের সামনে সমস্ত ভোটগুলি গণনা করাইল। এজন্য সে সমস্ত রাত্রি রিভলভার হাতে লইয়া বসিয়া রহিল পোলিং

বুথে। দেখা গেল পরাক্রান্ত মন্ত্রী মহাশয় অনেক ভোটে হারিয়া গিয়াছেন। ভোট গণনা যখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন সে নিদারুণ খবরটা পাইল। যোগীন্দরজি (এস-পি) নাকি রিভলবারের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। গুলিটা তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি এখন হাসপাতালে। ঘটনাটা ঘটিয়াছে নাকি অধিকলালের বাড়িতেই। অধিকলাল তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়া যাহা দেখিল তাহা আরও ভয়ানক। ফুলেশ্বরী গলায় দড়ি দিয়াছে। টেবিলের উপর যে ছোট চিঠিটা হিন্দীতে লেখা রহিয়াছে তাহার বাংলা এই—

"আমি চলিলাম। পরজন্মে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য অপেক্ষা করিও"......

...আজবলালও ভোটযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছিল। সেও অনেক ভোটে জিতিয়াছে...নূতন ক্যাবিনেটে একজন মন্ত্রীও হইয়াছে সে...

অধিকলাল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে তাহার মায়ের কাছে গিয়াছিল। ছেকা-ছেনি ভাষায় তাহাদের যে কথা হইয়াছিল তাহা এই।

"কি হাকিম সাহেব, কি খবর—"

"আমি আর হাকিম নই। আমি তোমার ছেলে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। তোমার কাছেই থাকব, তোমার সঙ্গেই মাঠে গিয়ে চাষবাসের কাজ করব"

"ও কাজ তুমি পারবে ?

"নিশ্চয়ই পারব—"

"ঢের হয়েছে। ওসব মজুরের কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমি তোমাকে দুবেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারব। চাকরি ছাড়লে কেন ?

"চাকরি করতে পারলাম না।"

সমুন্দরি অধিকলালকে কোনদিন মাঠে যাইতে দেয় নাই। শেষে অধিকলাল গ্রামেরই কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া একটা পাঠশালার মতো খুলিয়াছিল। বিনা পয়সায় সকলকে পড়াইত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া পাঠশালার 'পণ্ডিতজি' হইয়াছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। অনেক ছেলেমেয়ে জুটিতে লাগিল। রামগোবিন আসিয়া হাজির হইল একদিন। বলিল—তুমি যে মহাত্মা লোক তাহা আমি অনেকদিন আগেই বুঝিয়াছিলাম। এখন বল কিভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি? পাঠশালার জন্য একটা পাকা ঘর বানাইয়া দিব? অধিকলাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"না এখন সে সব দরকার নাই। এখন আমার পাঠশালা গাছতলাতেই বসুক—"

এইভাবেই কোনক্রমে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাও চলিল না। সমুন্দরি একদিন মাঠ হইতে ফিরিল না। একটা ডুলিতে করিয়া তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া আনিল মাঠের চাষারা। রনছোড় বলিল প্রকাণ্ড একটা ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া সমুন্দরি বাড়ির দিকেই আসিতেছিল—হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না। হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল রণছোড়। ... ...

[ইহার পর অনেকটা অংশ নাই। নখুকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল সেইটি শুধু আছে]

ভাই নখু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। বেশ, তোমাদের বাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার মা যে আমার কাছে এসে থাকতে চেয়েছেন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি আর কল্পনা করতে পারি না। তোমার ও তনুর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার আমি নিশ্চয়ই নিব।

বনিয়াদটা ভালো করে' দেব, তারপর তাদের বড় স্কুলে কলেজে পড়িও। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদেরও আমি পড়াব তোমার বাড়িতে। আমাদের দেশ পুণ্যভূমি। আমাদের দেশে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মানুষ করতে হবে। এখন শিক্ষার দোষে তারা জানোয়ার হ'য়ে যাচ্চে। সেটা আমাদেরই লজ্জা, আমাদেরই অক্ষমতা। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভালোবাসা মহৎ প্রেরণা দিয়ে তাদের গড়তে হবে। তাদের জন্য সব দিতে হবে, নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে, তবেই তারা মানুষ হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ছে—

> আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
> আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী ॥
> আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
> আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
> সব দিতে হবে।

আমি সব দিতে প্রস্তুত আছি ভাই। আমার ভালবাসা নাও। মাকে প্রণাম দিও। ইতি

খুদরুদা

—ঃ শেষ ঃ—

আ

ইন্দ্রজিৎ সেন
লবঙ্গ বনে ঝড়
ফেড ইন ফেড
বিক্ষুব্ধ রোডেসি
আরব-কাঁটা ইজর

সঞ্জয় সেন
নেপাল থেকে

সম্রাট সেন
যশোরেশ্বর
শিবাজীর স্বপ্ন
অধিবাস

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যা
পাপী

নীলপদ্ম করতলে কবি
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
বারোয়ারী বিবি
সুলতানা চৌধুরী
তুর্কি হারেম

দ্বৈপায়ন
মেহেরউন্নিসা
মতিবাঈ

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বাদশাহী মসনদ
হিটলারের শেষ বি

পরিতোষ মজুমদার
রাইনের ঢেউ